

ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম

ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম

সাকিবুল ইসলাম



প্রথম প্রকাশ • বইমেলা ২০২০

প্রকাশক • তোফাজ্জল হোসেন

বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অফিসবিন্যাস • রাসেল আহমেদ, প্রগতি কম্পিউটার

২২/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ • প্রগতি প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

২২/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ •

দাম •০০ টাকা মাত্র

পরিবেশক • সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

ISBN : 978-984-8044-.....

Phone : 47114424, 01819214049, 01711-198570.

E-mail : bsbhaban@gmail.com

বিশ্বসাহিত্য ভবনের যে কোনো বই ঘরে বসে পেতে ভিজিট করুন

www.rokomari.com

অথবা ফোন করুন : ৪৭১১৪৪২৪

উৎসর্গ

সূচিপত্র

পূর্বকথা
আলোর প্রতিফলন
কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস
সাবানের বুদবুদ
আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সমান
অপবর্তন হেটিং এবং রংধনু
আলোর প্রতিসরণ
আলোর সরল-গরল পথ
লেস তৈরি
ব্যতিচার
ইলেকট্রন কি আলোর বেগে চলতে পারে?
কোটন এবং ইলেকট্রনের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক
ফাইনম্যান ডায়গ্রাম
ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন
লেজার এবং পলির বর্জন নীতি
কোয়ার্ক
বিটা রশ্মির বিকিরণ
সবল এবং দুর্বল নিউক্লিয় বল
আরো আরো পার্টিকেল

পূর্বকথা

পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের এমন এক শাখা যেখানে প্রাকৃতিকভাবে যে ঘটনাগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হই সেগুলোকে গাণিতিকভাবে বা তত্ত্বীয় আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রাচীন দার্শনিক বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা যেমন গতি, তাপ, শব্দ ইত্যাদি ঘটনাগুলোকে পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

জগৎখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন যখন ১৬৮৭ সালে তার প্রকাশিত বই *ফিলোসোফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা* বইতে গতির তিনটি সূত্র প্রথম প্রকাশ করেন, তখন সবাই চিরচেনা জগৎটাকে একটু ভিন্নভাবে দেখা শুরু করে। শব্দের উৎপত্তি নিউটনের গতির সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল। বলা হল মাধ্যমের কনার স্পন্দনগতির কারণে শব্দ তৈরি হয়। তাপ সম্পর্কে বলা হল কণাগুলোর অনিয়মিত ছোট্টাছুটির ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। প্রায় সবকিছুই নিউটনীয় বলবিদ্যা বা নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল।

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন এই যুগটাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান। গতি দিয়ে ব্যাখ্যা চলাকালীন এই যুগে প্রকৃতিতে নতুন একটা ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা শুরু হল। তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব সম্পর্কে মানুষ আরও ভালভাবে জানা শুরু করল।

১৮৭৩ সালে জেমস ম্যাক্সওয়েল বললেন তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের মিলিত রূপ হচ্ছে আলো। বলা হল আলোর দুইটি উপাদান— তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র অর্থাৎ আলো তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ। এই তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গও নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা হল।

১৯০০ সালের গোড়ার দিকে নতুন একটা তত্ত্ব দাঁড় করানো হল। সেখানে বলা হল পদার্থ আধানযুক্ত ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরি, এই আধানযুক্ত কণিকা হল ইলেকট্রন ও প্রোটন। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার আচরণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হল নিউটনীয় গতিবিদ্যা। সৃষ্টি হল পদার্থবিজ্ঞানের নতুন এক শাখা কোয়ান্টাম মেকানিকস— এই তত্ত্বটা খুবই অদ্ভুত এবং একইসাথে এখন পর্যন্ত

সবচেয়ে সফল ও দূর্বোধ্য তত্ত্ব। এই দূর্বোধ্যতার কারণ হল প্রকৃতিই কোয়ান্টাম মেকানিকস মেনে চলে।

কোয়ান্টাম মেকানিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কিভাবে দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে পানি তৈরি হয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্স পদার্থের ধর্ম, আচার-আচরণ সবকিছু সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলেও ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের সাথে ব্যাখ্যাগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হচ্ছিল। ফলে নতুন একটা থিওরি তৈরির চেষ্টা করা হল কিভাবে এই তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। নতুন এই থিওরীর নাম দেওয়া হল কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস। যা গম শতকের শুরুর দিকে ওলফগ্যাং পলি, ইউজিন উইগনার, প্যাসক্যাল জর্ডান, ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, পল ডিরাক-এর মত কিছু পদার্থবিজ্ঞানীর হাতে জন্ম নেয়। কিন্তু শুরুতেই এই থিওরীটা বড়সড় একটা ধাক্কা খায়। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। এই ধরণের ঘটনা পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। এই থিওরী দিয়ে ইলেকট্রনের ম্যাগনেটিক মোমেন্ট তাত্ত্বিকভাবে হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল তার মান 1 এর কাছাকাছি। পল ডিরাক এই মানটাকে 1 ধরে নিলেন। বাস্তবে ১৯৪৮ সালে পরীক্ষামূলকভাবে যখন এই ম্যাগনেটিক মোমেন্টের মান হিসাব করা হলো তখন দেখা গেল তার মান 1 এর চেয়েও বেশি 1.00118 ± 3 । বিজ্ঞানীদের চোখতো ছানাবড়া! নিশ্চয়ই পরীক্ষা পদ্ধতিতে কোন ভুল আছে। আরও নির্ভুলভাবে হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল এই মান অসীম! মানে যত নির্ভুলভাবে পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রনের ম্যাগনেটিক মোমেন্টের মান হিসাব করতে যাই দেখা যাবে মান অসীমের কাছাকাছি চলে যায়। তার মানে কি কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস ভুল? কাগজে কলমে তত্ত্বীয় জটিল সমীকরণের সমাধানের সাথে ল্যাবরেটরিতে বসে বসে পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত হিসাবের কোন মিলই নেই!

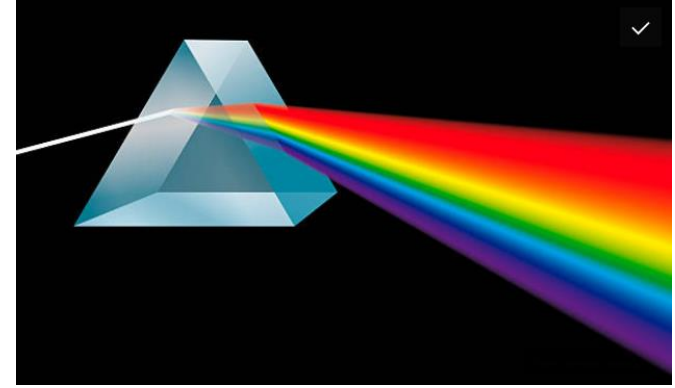
অবশেষে ১৯৪৮ সালে জুলিয়ান সুইঞ্জার, সিন ইনতিরো তোমানাগা আর রিচার্ড ফিলিপ ফাইনম্যান এর সমাধান করলেন। দেখালেন কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস সঠিক। এটা আলোর সাথে পদার্থের মিথস্ক্রিয়া দেখায়। ফাইনম্যান এই থিওরীটাকে বললেন পদার্থবিজ্ঞানের অলংকার। ১৯৬৪ সালে তাদের এই অবদানের জন্য তিনজনকেই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস হচ্ছে এমন একটা থিওরী যা দিয়ে মহাকর্ষীয় প্রভাব ও তেজস্ক্রিয়তার বিকিরণ ব্যতীত বাকী সকল প্রাকৃতিক ঘটনা সফলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মোটরকারের জ্বালানী পোড়ানো,

সাবানের বুদবুদ, লবণ/তামার দৃঢ়তার ব্যাখ্যা সব দেয়া সম্ভব এই কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে।

আলোর প্রতিফলন

নিউটন প্রথম প্রিজমের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, আলো হচ্ছে সাত রঙের মিশ্রণ। একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সেটা প্রমাণ করেন। অন্ধকার ঘরে ছোট্ট একটি ছিদ্র দিয়ে আসা আলোর প্রবেশমুখে একটি প্রিজম ধরলে বিপরীত দিকের দেয়ালের পর্দায় সাত রঙের এক বর্ণালী দেখা যায়।



চিত্র ১: সূর্যের সাদা আলো যে সাতটি রঙের সমন্বয়ে তৈরি প্রিজমের সাহায্যে নিউটন সেটা প্রমাণ করে দেখান। এখানে পর্দায় যথাক্রমে ওপর থেকে নিচে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, আসমানি ও বেগুনি রং দেখা যায়।

নিউটন প্রিজমের সাহায্যে আলোর যে অংশটাকে সাত রঙে বিভক্ত করেন তা হচ্ছে দৃশ্যমান আলো। আমরা আমাদের আশেপাশে যে আলো দেখি তাই দৃশ্যমান আলো।

এই দৃশ্যমান আলো হচ্ছে আলোর ক্ষুদ্র একটা অংশ। এর বাইরেও তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ আছে যা আমরা দেখতে পাই না। যে ক্ষেত্রে এই তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ হিসাব করা হয় তার নাম তরঙ্গদৈর্ঘ্য। আমরা শুধুমাত্র 400-700 ন্যানোমিটার এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখতে পাই।

দৃশ্যমান আলোর চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি যা ফটোগ্রাফিক প্লেটে দেখা সম্ভব। এর বাইরেও আছে এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি।

দৃশ্যমান আলোর চেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ইনফ্রারেড রশ্মি- যা তাপ থেকে আসে। এছাড়াও আছে বেতার তরঙ্গ। এগুলো সব আলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের।

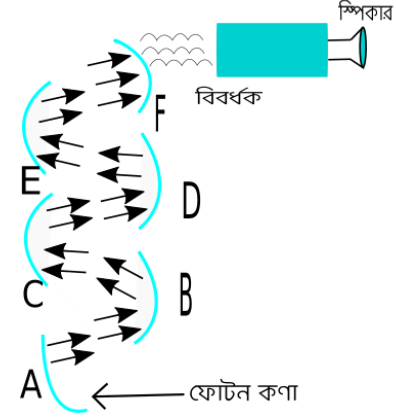
রেডিও তরঙ্গ	মাইক্রো তরঙ্গ	ইনফ্রারেড রে	দৃশ্যমান আলো	আল্ট্রা ভায়োলেট রে	এক্স রে	গামা রে	কসমিক রে
-------------	---------------	--------------	--------------	---------------------	---------	---------	----------

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ডান থেকে বামে

চিত্র ২: ডান থেকে যত বামে যাবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বৃদ্ধি পাবে। এই বিশাল পাল্লার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র একটা অংশ দৃশ্যমান আলো। 400-700 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে কোন আলোই দৃশ্যমান আলো।

এই বিশাল বিস্তৃত আলোর জগতের ক্ষুদ্র একটা অংশ। দৃশ্যমান আলোর লাল রং নিয়ে আমরা কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। নিউটন মনে করেছিলেন আলো কণা দিয়ে তৈরি। নিউটন আসলেও সঠিক ছিলেন আলো যে কণা দিয়ে তৈরি তার নাম ফোটন কণা। মানব মস্তিষ্কের চোখের নার্ভ বা স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করতে ৫-৬টি ফোটন কণার দরকার হয়। তো আলো যদি ফোটন কণা দিয়ে তৈরি না হত আমরা হয়ত চোখে দেখতাম না। এইখানে ছোট্ট একটি প্রশ্ন- একটি উজ্জ্বল ও স্তিমিত আলোক উৎসের ফোটন কণাদ্বয়ের আকার কেমন হবে?

উত্তর হচ্ছে আকার একই হবে। কিন্তু ফোটন কণার পরিমাণ উজ্জ্বল আলোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি এবং অন্যদিকে স্তিমিত আলোর ক্ষেত্রে কম হবে। ব্যাপারটা অনেকটা বৃষ্টির ফোটার সাথে ব্যাখ্যা করা যায়। বৃষ্টি বেশি মানে হচ্ছে বৃষ্টির ফোটার পরিমাণ বেশি। অন্যদিকে বৃষ্টি কম মানে হচ্ছে বৃষ্টির ফোটার পরিমাণ কম। কিন্তু পরিবেশের অবস্থা (যেমন তাপমাত্রা, তাপ সান্দ্রতা ইত্যাদি) একই রকম থাকলে উভয়ক্ষেত্রেই বৃষ্টির ফোটার আকার একই থাকে। একই ঘটনা ঘটে এক রঙা আলোক উৎসের ক্ষেত্রে। উৎসের ফোটন কণার আকার একইরকম হলেও স্তিমিত আলোর ক্ষেত্রে ফোটন কণার পরিমাণ কম, অন্যদিকে উজ্জ্বল আলোর ক্ষেত্রে ফোটন কণার পরিমাণ বেশি। তো এই ব্যাপারটা একটু পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করা যাক। পরীক্ষা করার জন্য দরকার একটা ফটোমাল্টিপ্লায়ার, তো এটা কীভাবে কাজ করে?



চিত্র ৩: ফটোমাল্টিপ্লায়ারে বেশ কিছু ধাতব পাত থাকে যেমন A, B, C, D। ফোটন কণা ধাতব পাতে আপতিত হলে যেখান থেকে কিছু ইলেকট্রন নির্গত হয়। নির্গত ইলেকট্রনগুলোকে আবারো ধাতব পাতে সংঘর্ষে লিপ্ত করা হয়। সেখানে থেকে আরো কিছু ইলেকট্রন বের হয়। সংঘর্ষে যখন পর্যাপ্ত ইলেকট্রন প্রবাহ পাওয়া যায় তখন স্পিকারে একটা শব্দ তৈরি হয়।

ফটোমাল্টিপ্লায়ারে বেশ কিছু ধাতব পাত থাকে। যখন একটি ফোটন কণা ধাতব পাত A-কে আঘাত করে তখন পাত A থেকে বেশ কিছু ইলেকট্রন বের হয়ে আসে। এই বের হয়ে আসা ইলেকট্রনগুলো B পাতকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে (আসলে B পাতটি ধনাত্মক চার্জে আহিত অবস্থায় থাকে)। ফলে B পাত থেকে আরো কিছু ইলেকট্রন বের হয়। এই ইলেকট্রনগুলোকে C পাত আকর্ষণ করে। ফলে C পাতের সাথে ইলেকট্রনগুলোর সংঘর্ষের ফলে আরও কিছু ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই ঘটনাটা যখন ১০ থেকে ১২ বারের মত ঘটানো হয় তখন পর্যাপ্ত ইলেকট্রন দিয়ে স্পিকারে শব্দ তৈরি করা হয়।

ঠিক এইভাবে যখনই একটা ফোটন কণা ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আঘাত করে তখন স্পিকারে একটা শব্দ হয়। এখন ফটোমাল্টিপ্লায়ারের স্পিকারে যদি উজ্জ্বল ও স্তিমিত আলো দিয়ে শব্দ তৈরি করা হয় তখন দেখা যাবে উভয় আলোক উৎসের জন্য একই তীব্রতায় স্পিকার শব্দ তৈরি করছে, কিন্তু উজ্জ্বল আলোর জন্য শব্দ খুব দ্রুত তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে স্তিমিত আলোর জন্য এই শব্দ কিছুক্ষণ পর পর তৈরি হচ্ছে।

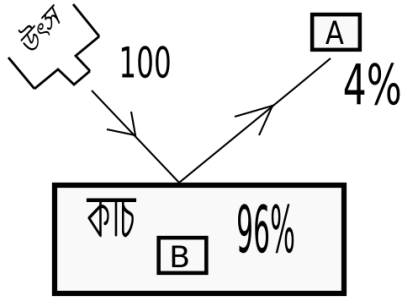
তার মানে নিউটন যে ধারণা করেছিলেন, আলো কণা দিয়ে তৈরি সেটা সঠিক এবং আমরা আধুনিক যুগে এসে জানলাম এই কণার নাম ফোটন কণা। আলো যে ফোটন কণা দিয়ে তৈরি সেটার একটা প্রমাণও দেখলাম।

তাহলে একটা ঘটনা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, একটা তল থেকে আলো কিভাবে প্রতিফলিত হয়।

টলটলে স্বচ্ছ পানিতে চাঁদের আলোর প্রতিফলন অনেকেই দেখেছে। আমরা চাঁদের আলোর মায়াবী যে প্রতিফলনে মুগ্ধ হই তার নাম আংশিক প্রতিফলন। কাঁচ এই ধরনের প্রতিফলন দেখায়। দিনের বেলায় বদ্ধ ঘরের বাতি জ্বালিয়ে কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর সময় মাঝে মাঝে কাঁচের জানালায় বাতির গোলাকার যে প্রতিফলন দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে এই আংশিক প্রতিফলন।

আংশিক প্রতিফলনের সময় আলো তল থেকে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না খুব অল্প একটা অংশ প্রতিফলিত হয়। ধরি এই অংশটা মোট আলোর 4% বাকী 96% আলো তল ভেদ করে চলে যায়।

এবার একটি পরীক্ষা করা যাক। পরীক্ষার জন্য দরকার লাল রঙের আলোক উৎস, একটি ফটোমাল্টিপ্লায়ার, একটি কাচ। লাল রঙের আলোক উৎস থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার A-তে যাবে এবং আলোর যে অংশ কাচের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করবে সেটা কাচের মধ্যে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্লায়ার B-তে প্রবেশ করবে। ফটোমাল্টিপ্লায়ার কাঁচের ভেতর B স্থানে কীভাবে প্রবেশ করবে সেই তর্কে না যাই!

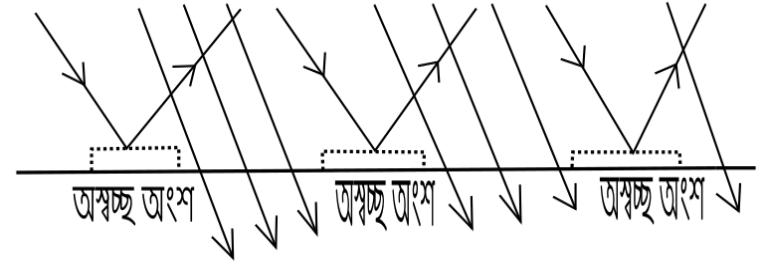


চিত্র ৪: একটি লাল রঙের উৎস থেকে আলো কাচ মাধ্যমে আপতিত হলে 96% আলো কাচ ভেদ করে চলে যায় যা কাচে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্লায়ার B-তে ধরা পড়ে। অন্যদিকে 4% আলো প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার A-তে পৌঁছায়।

তো আমরা কী দেখতে পাব?

দেখা যাবে লাল রঙের আলোক উৎস থেকে যদি 100 টা ফোটন কণা বের হয় তাহলে 4 টা আলোর কণা A অবস্থানে বসানো ফটোমাল্টিপ্লায়ারে ধরা পড়বে আর বাকী 96 টা আলোর কণা কাচে অবস্থিত B তে ধরা পড়বে।

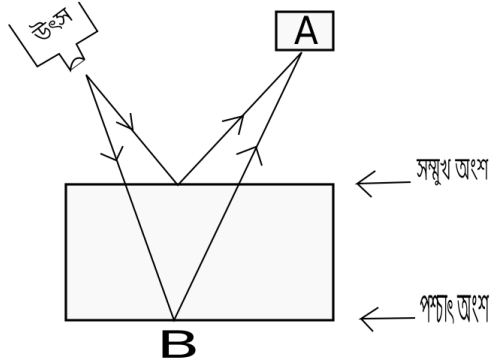
এটা খুবই সাধারণ প্রশ্ন। কেন 4% আলো A তে আসবে আর বাকী 96% আলো B তে যাবে। আলো কি আগে থেকেই চিন্তা করে রাখে যে 100 টা আলোর কণার মধ্যে 4 টা A তে আসবে আর বাকী 96 টা B তে যাবে? নিউটন এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেবেন কীভাবে? অনেকেই মনে করতেন কাঁচ আসলে কিছু স্বচ্ছ আর অস্বচ্ছ জায়গা দিয়ে তৈরি। কাঁচের 96% হচ্ছে স্বচ্ছ যেখান দিয়ে আলো B তে প্রবেশ করে আর বাকী 4% অস্বচ্ছ আলো যেখানে আপতিত হলে প্রতিফলিত হয়ে A তে প্রবেশ করে।



চিত্র ৫: কাঁচের কিছু স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ অংশ থাকে। আলো যখন অস্বচ্ছ অংশে আপতিত হয় তখন আলো প্রতিফলিত হয় স্বচ্ছ অংশ দিয়ে আলো মাধ্যম ভেদ করে চলে যায়।

কিন্তু নিউটনের এই ব্যাখ্যা মোটেও মনঃপূত হলো না। কারণ অস্বচ্ছ অংশটা আসলে মসৃণ করা সম্ভব। যদি শিরীষ কাগজ বা ওই জাতীয় পদার্থ দিয়ে অস্বচ্ছ অংশগুলো স্বচ্ছ করা হয় তাহলেও দেখা যাবে 4% আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

এইবার আমি যদি কাচ ফলকের পুরুত্ব বাড়ানো শুরু করি— তাহলে কী ধরনের ফলাফল পাওয়া উচিত? যখন কাচ ফলকের পুরুত্ব বাড়ানো হবে তখন কাচের দুইটা তল থাকবে।

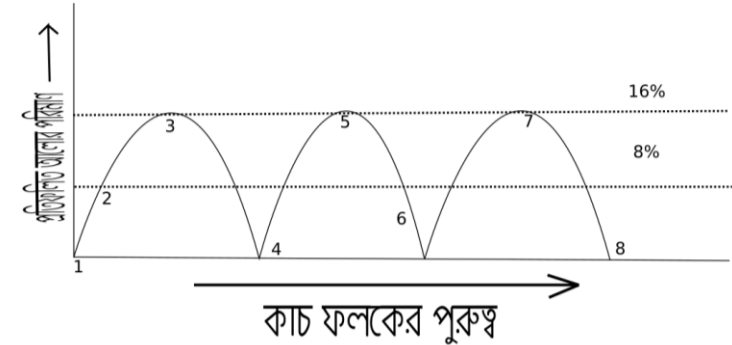


চিত্র ৬: কাচের পুরুত্ব বাড়ানো হলে কাচের দুইটি তল থাকছে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ। এই ক্ষেত্রে আলো সম্মুখ এবং পশ্চাৎ দুই তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লয়ার A তে পৌঁছাবে। ফলে আলো সম্মুখ তল থেকে 4% এবং পশ্চাৎ তল থেকে 4% প্রতিফলিত হয়ে মোট 8% আলো ফটোমাল্টিপ্লয়ার A তে আসা উচিত। আলো কিন্তু মোটেও এইভাবে প্রতিফলিত হয় না। প্রতিফলিত হয় চিত্র ৭-এর মত।

তো স্বাভাবিকভাবে কাচ ফলকের পশ্চাৎ অংশ থেকেও আলো প্রতিফলিত হয়ে A অবস্থানে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্লয়ারে প্রবেশ করবে। এখানেও যদি 4% আলো প্রতিফলিত হয় তাহলে সম্মুখ অংশের 4% আলো ও পশ্চাৎ অংশের 4% আলো মোট 8% আলো ফটোমাল্টিপ্লয়ারে আসা উচিত। কিন্তু নিউটন অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করলেন লাল রঙের আলোক উৎস মোটেও এইভাবে প্রতিফলিত হয় না। প্রতিফলিত হয় চিত্র-৭ এর মত।

কাঁচ ফলকের পুরুত্ব

চিত্র ৭: নিউটন আলোর প্রতিফলনের এইরকম একটা উত্থান-পতন দেখতে পেলেন। কাচ ফলক নির্দিষ্ট পুরুত্ব পরপর একই রকম প্রতিফলন দেখায়। (3) ও (5) নং অবস্থানের পুরুত্বের জন্য সর্বোচ্চ 16% প্রতিফলন দেখায়। অন্যদিকে (2) নং অবস্থানের পুরুত্বের জন্য 4% এবং (6) নং অবস্থানের পুরুত্বের জন্য 8% এর চেয়েও কম প্রতিফলন দেখায়। যখন পুরুত্ব থাকে না তখন কোন প্রতিফলনই দেখায় না (1) নং অবস্থানের মত- আবার যখন পুরুত্ব বাড়তে পাড়াতে (4) নং অবস্থানে নিয়ে আসা হয় তখনও কোন প্রতিফলন পাওয়া যায় না।



চিত্র-৭: অনুযায়ী যখন কাচ ফলকের কোন পুরুত্বই নেই তখন কোন আলোই প্রতিফলিত হয় না। ফলে (1) নং অবস্থানের পুরুত্বের জন্য আলো কাচ ভেদ করে চলে আসে।

যখন পুরুত্ব আরেকটু বাড়ানো হয় এবং পুরুত্ব যখন (3) নং অবস্থানে আসে তখন দেখা যায় 16% আলো প্রতিফলিত হয়। পুরুত্ব বাড়তে বাড়তে আবার যখন (4) নং অবস্থানের পুরুত্ব নিয়ে আসা হয় তখন আবার দেখা যায় কোন আলোই প্রতিফলিত হচ্ছে না। আসলে এই যে পুরুত্ব একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে বাড়ানো হলে কাচের জন্য একবার প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে আরেকবার পাওয়া যাচ্ছে না, এই ব্যাপারটা নিউটনকে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল।

নিউটন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে লাল রঙের আলোক উৎস ঠিক কোন না কোনভাবে বুঝতে পারে এইটা কোন পুরুত্বের কাঁচ ফলক এবং সেই অনুযায়ী প্রতিফলিত হয়।

নিউটন এই ব্যাপারটার একটা গালভরা নাম দিলেন ‘ফিটস অব ইজি রিফ্লেকশন অর ইজি ট্রান্সমিশন’ আমিও এর একটা গালভরা নাম দিলাম “যখন দরকার প্রতিফলিত হবে আর যখন দরকার তখন কাচ ফলক ভেদ করে চলে যাবে।”

নিউটনের পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। বলা হয় আলোর তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য যোগ হয় ফলে আমরা প্রতিফলন দেখতে পাই। আর যেখানে দুইটি তরঙ্গ একে অপরকে নাকচ করে দেয় সেখানে কোন প্রতিফলন দেখতে পাই না।

কিন্তু তরঙ্গ তত্ত্ব অনুযায়ী A অবস্থানে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্রায়ারে আলো যখন প্রতিফলিত হয়ে আসে তখন চিত্র-৭ অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট কাচ পুরুত্ব যেমন (3) ও (5) নং অবস্থানের জন্য অধিক তীব্রতায় এবং (2) ও (6) নং অবস্থানের জন্য অল্প তীব্রতায় শব্দ তৈরি করা উচিত।

কিন্তু কখনই এমন ঘটনা ঘটে না। আলো সব সময় একই তীব্রতায় শব্দ তৈরি করে কিন্তু (2) নং অবস্থানের কাঁচ ফলকের পুরুত্বের জন্য শব্দ যত দ্রুত তৈরি হয় (5) নং অবস্থানের কাঁচ ফলকের জন্য শব্দ মোটেই তত দ্রুত তৈরি হয় না।

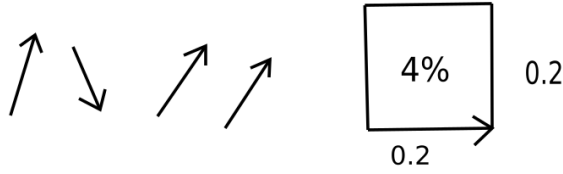
কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস

নিউটন আলোর আংশিক প্রতিফলন চিরাচরিত পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স দিয়ে। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স দিয়ে আকাশের রংধনু, লেন্স তৈরির কৌশল এবং আমরা যে চিত্রটা নিয়ে মহাযন্ত্রনায় পড়লাম সব ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে আলোর ঘটনা আমরা যেরকম আলোক কণা বা তরঙ্গ হিসেবে দেখে অভ্যস্ত সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস তত্ত্বানুযায়ী এইসব আলোকীয় ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয় সম্ভাবনা দিয়ে।

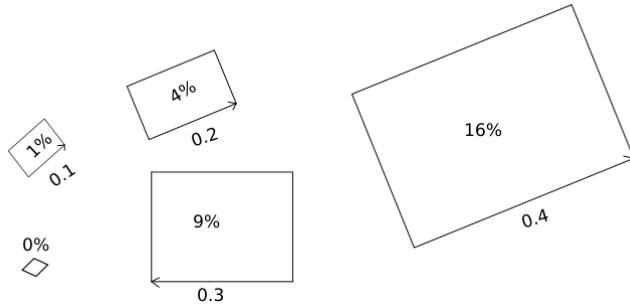
আমরা কখনোই ব্যাখ্যা করতে পারি না ফোটন কিভাবে সিদ্ধান্ত নয় সে প্রতিফলিত হবে নাকি কাঁচ ফলক ভেদ করে চলে যাবে। এই ধরনের চিন্তা করাও সমীচীন নয়। আমরা যেই প্রশ্নটা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রতিফলনের সম্ভাবনা কত এবং মাধ্যম ভেদ করে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কত?

এই সম্ভাবনাকে প্রকাশ করা হয় ছোট ছোট তীর চিহ্ন দিয়ে, যা দেখতে অনেকট ভেক্টরের মত। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস অনুযায়ী এই ভেক্টরের দৈর্ঘ্যের বর্গই হচ্ছে সম্ভাবনা। আমরা আংশিক প্রতিফলনে দেখেছি লাল রঙের আলোক উৎস থেকে আলো কাচ মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্রায়ার A তে আসার সম্ভাবনা হচ্ছে 4%। তাহলে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে এই 4% সম্ভাবনা প্রকাশ করতে হলে এমন একটি ভেক্টর আঁকতে হবে, যার দৈর্ঘ্য 0.2। এই 0.2 এর বর্গই হচ্ছে 0.04 যা শতকরায় 4%।



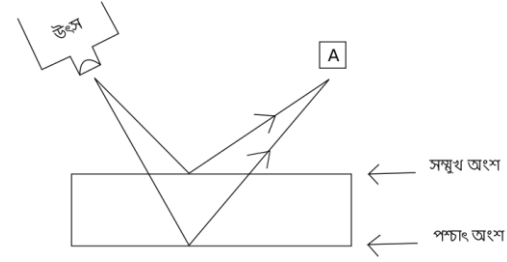
চিত্র ৮: কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস অনুযায়ী সম্ভাবনা হিসাব করা হয় এরকম ছোট ছোট তীর চিহ্ন দিয়ে, যা অনেকটা ভেক্টরের মত। এইসব ভেক্টরের দৈর্ঘ্যকে বর্গ করলেই কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা পাওয়া যাবে। যেমন ৪% সম্ভাবনা পেতে হলে ০.২ দৈর্ঘ্যের একটি ভেক্টর দিয়ে ঘটনাটিকে প্রকাশ করতে হবে।

আমরা যখন পুরুত্ব পরিবর্তন করতে থাকি তখন আমরা দেখেছি যে প্রতিফলিত আলোর পরিমাণ ০ থেকে ১৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে ঘটনাটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, ফোটন কণা প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার A তে আসার সম্ভাবনা কাচের পুরুত্বের উপর নির্ভর করে ০ থেকে ১৬% পর্যন্ত হতে পারে।



চিত্র ৯: ০ থেকে ১৬% পর্যন্ত আলো প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৯% আলোর প্রতিফলন ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন ০.৩ দৈর্ঘ্যের একটি ভেক্টর, যার বর্গই হচ্ছে ৯% আলো প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা। ঠিক তেমনিভাবে ১৬% সম্ভাবনায় প্রতিফলিত আলোর জন্য প্রয়োজন ০.৪ একক দৈর্ঘ্যের একটি ভেক্টর। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসে এই ভেক্টরকে বলা হয় “প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড”

যখন আমরা পুরুত্ব বাড়িচ্ছি তখন ফোটন কণা ফটোমাল্টিপ্লায়ারে দুইভাবে আসতে পারে— কাঁচ ফলকের সম্মুখ অংশ থেকে এবং কাচ ফলকের পশ্চাৎ অংশ থেকে।



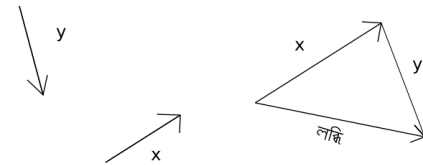
চিত্র ১০: কাচ ফলকের পুরুত্ব থাকার কারণে আলো সম্মুখ অংশ এবং পশ্চাৎ অংশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার A তে পৌঁছায়। আলোর সম্মুখ অংশ থেকে প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং পশ্চাৎ অংশ থেকে প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা আলাদা আলাদা ভাবে হিসাব করে মোট সম্ভাবনা বের করতে হবে।

কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস অনুযায়ী যখন একের অধিক ঘটনা ঘটে তখন প্রতিটি আলাদা আলাদা ঘটনার জন্য সম্ভাবনা হিসাব করা হয়। তারপর সেগুলোকে যোগ করা হয়। একটু দেখা যাক কিভাবে কাজটা করা যায়।

কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসে সম্ভাবনা হিসাব করার জন্য তীরের মত যে ভেক্টর অঙ্কন করা হয় সেটা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড নামে পরিচিত।

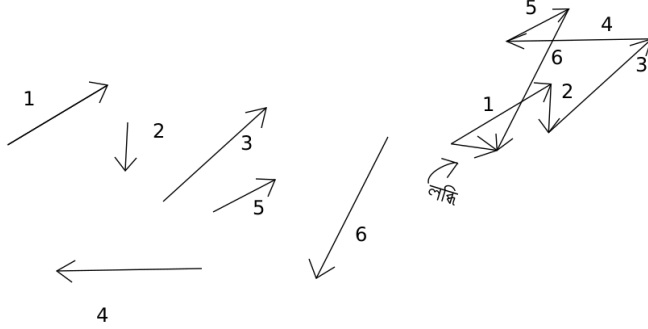
চিত্র-১১-তে একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে দেখানো হলো।

আরেকটি ঘটনা Y ঘটনার সম্ভাবনাও প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে প্রকাশ করা হল। দুইটি ঘটনার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড যোগ করলে যে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যাবে সেটার বর্গ হবে দুইটি ঘটনা একসাথে ঘটনার সম্ভাবনা। তো প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড বের করা যাবে?



চিত্র ১১: দুইটি ঘটনা X ও Y ঘটনার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে দেখানো হল। প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড X ও Y এর দিক অপরিবর্তিত রেখে পরপর বসিয়ে লব্ধি হিসাব করা হয়। এই লব্ধির বর্গই হচ্ছে দুইটি ঘটনা একসাথে ঘটনার সম্ভাবনা।

লন্দি পেতে হলে একটার শীর্ষের সাথে আরেকটার পুচ্ছ পরপর বসাতে হবে। যেমন চিত্র-১১ এর মত করে X ও Y এর দিক অপরিবর্তিত রেখে X এর শীর্ষের সাথে Y এর পুচ্ছ বসানো হল। তারপর X এর পুচ্ছ থেকে Y এর শীর্ষ পর্যন্ত যোগ করে লন্দি পাওয়া গেল। ঠিক এইভাবে যে কোন সংখ্যক ঘটনার সম্ভাবনা বের করা সম্ভব।



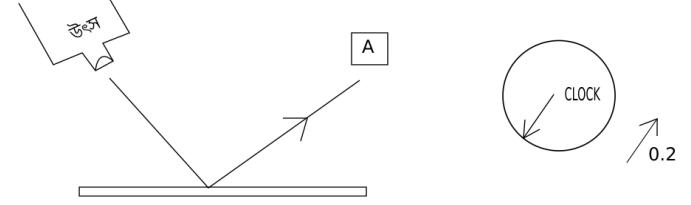
চিত্র ১২: এইখানে ছয়টি ঘটনার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড যথাক্রমে 1, 2, 3, 4, 5, 6 দিয়ে প্রকাশ করা হল। ঘটনাগুলোর দিক অপরিবর্তিত রেখে একটির পর একটা বসিয়ে লন্দি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হিসাব করা হল। এই লন্দির বর্গই হচ্ছে ছয়টি ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনা।

আসলে লন্দি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড বের করার প্রক্রিয়া অনেকটা লন্দি ভেক্টর হিসাব করার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অনেকগুলো ভেক্টরের যোগফল পেতে হলে আমরা যেমন একটার পর একটা ভেক্টর বসাই, তারপর প্রথম ভেক্টরের পুচ্ছ থেকে শেষ ভেক্টরের শীর্ষ হিসাব করে লন্দি ভেক্টর পাই এইখানেও ঠিক একই কাজটি করা হয়েছে।

এইবার আমরা দেখব এই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে কিভাবে আমরা আংশিক প্রতিফলন, আলোর কাচ মাধ্যমে প্রবেশের সময় বেকে যাওয়া, লেন্স তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করা যায়। মোট কথা আমরা এখন কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে এই ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করব।

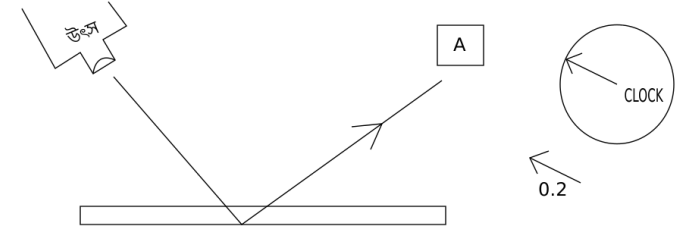
আমরা সবাই জানি ভেক্টরের একটি দিক থাকে। তো খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আসা উচিত প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক কিভাবে নির্ণয় করব? এইজন্য আমাদের একটি স্টপওয়াচের সাহায্য নিতে হবে। লাল রঙের আলোক উৎস থেকে আলো কাচে প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার A তে আসতে মোট যে সময় নেয় সেই সময় স্টপওয়াচের কাটা যে দিকে থাকে সে দিকই হচ্ছে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক।

একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, সম্মুখ অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোর প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক হবে স্টপওয়াচের উল্টো দিকে। আর এই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দৈর্ঘ্য হবে 0.2।



চিত্র ১৩: সম্মুখ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক হচ্ছে আলো উৎস থেকে কাচ ফলকে প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার A তে পৌঁছাতে যে সময় নেয় সেই সময়ে স্টপওয়াচের কাটার ঠিক বিপরীত দিক হচ্ছে সম্মুখ অংশের জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক। এই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 0.2।

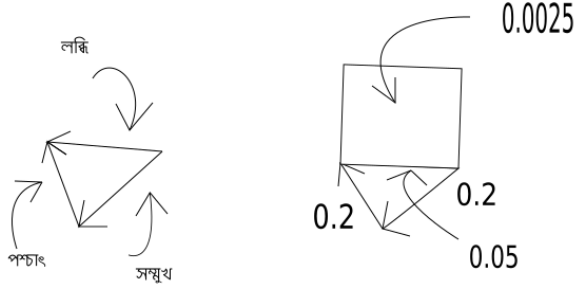
ঠিক একইভাবে উৎস থেকে আলো কাচের পশ্চাৎ অংশে প্রতিফলিত হয়ে যখন ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আসে তখন যদি স্টপওয়াচের সময় হিসাব করি তখন দেখা যাবে কিছু বেশি সময় লেগেছে। কারণ আলোকে এইক্ষেত্রে কাচ ফলকের পুরুত্বের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে পশ্চাৎ অংশে প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আসতে হয়েছে।



চিত্র ১৪: পশ্চাৎ অংশে প্রতিফলনের সময় আলো একটু বেশি সময় নেয়। এর কারণ হচ্ছে কাচ ফলকের পুরুত্ব। ফলে স্টপওয়াচের কাটা একটু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। স্টপওয়াচের কাটা যে দিকে, পশ্চাৎ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক সেদিকে এবং এর দৈর্ঘ্য 0.2।

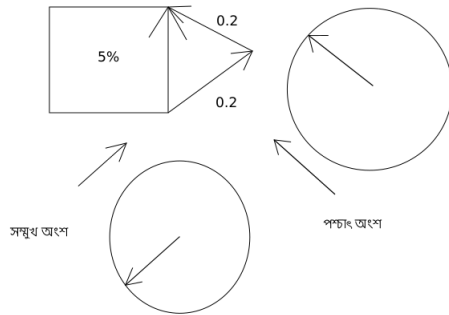
সম্মুখ অংশ এবং পশ্চাৎ অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোর প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হিসাব করে একটার পর একটা বসানোর পর লন্দি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যাবে। এই লন্দি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের বর্গই হচ্ছে আংশিক প্রতিফলনের পরিমাণ।

ফলে আমরা যদি খুব পাতলা কাচ ফলক নেই তখন দেখা যাবে সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মধ্যকার কোণ খুব কম। ফলে লব্ধির মান অনেক কম।



চিত্র ১৫: আংশিক প্রতিফলনের মান হিসাব করার জন্য সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান একটার পর একটা বসানো হল। কাচ ফলকের পুরুত্ব কম হওয়ায় এই আংশিক প্রতিফলনের মান প্রায় শূন্যের কাছাকাছি 0.0025।

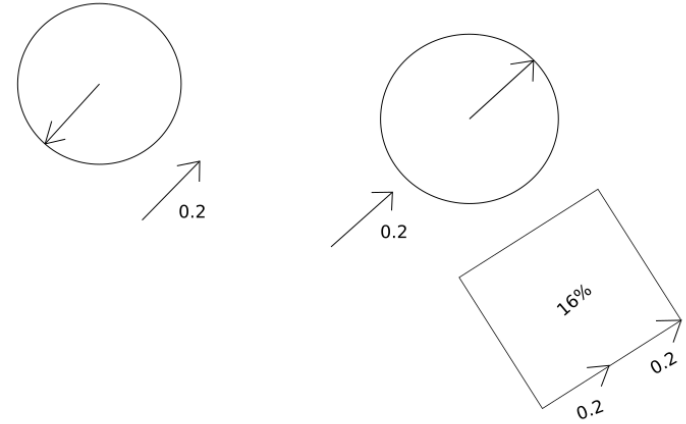
তার মানে দাঁড়াল পুরুত্ব খুব কম হওয়ায় নিউটন যেমন দেখেছিলেন আংশিক প্রতিফলনের মান শূন্য হবে, আমরাও তেমনি ঠিক শূন্যের কাছাকাছি একটা মান পেলাম (0.0025)। এইবার আমরা কাচ ফলকের পুরুত্ব বাড়াতে থাকি। সম্মুখ অংশের জন্য প্রতিফলনের সময় একই থাকবে এবং প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক হবে স্টপওয়াচের ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু কাচের পুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় পশ্চাৎ অংশের প্রতিফলনের সময় বেড়ে যাবে।



চিত্র ১৬: কাচ ফলকের পুরুত্ব বাড়ার কারণে সম্মুখ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক একই থাকলেও পশ্চাৎ অংশের প্রবাবিলিটির অ্যামপ্লিটিউডের দিক ভিন্ন হয়। উপরের চিত্রানুযায়ী মধ্যবর্তী কোণ বৃদ্ধি পায় ফলে আংশিক প্রতিফলনের মান 5% হয়।

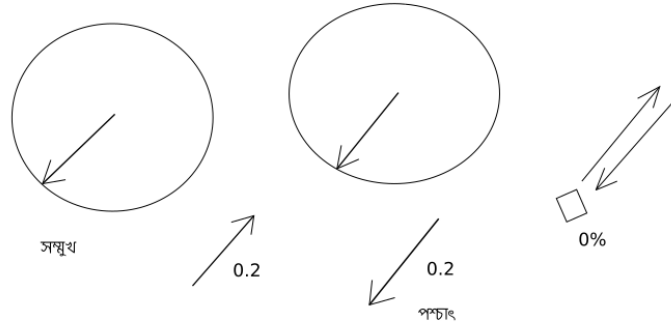
চিত্র-১৬ অনুযায়ী কাচ ফলকের পুরুত্ব বাড়ার কারণে আংশিক প্রতিফলনের মান বৃদ্ধি পেয়ে 5% এ উপনীত হল।

এইবার যদি আমরা এমন পুরুত্বের কাচ ফলক নেই যেখানে পশ্চাৎ অংশের প্রতিফলনের সময় স্টপওয়াচের কাটা একবার ঘুরে এসে সম্মুখ অংশের প্রতিফলনের জন্য স্টপওয়াচের কাটার ঠিক বিপরীত দিকে এসে থাকে? অর্থাৎ সম্মুখ অংশের প্রতিফলনের সময় স্টপওয়াচের কাটার দিক এবং পশ্চাৎ অংশের প্রতিফলনের সময় স্টপওয়াচের কাটার দিকের মধ্যবর্তী কোণ 180° হলে আংশিক প্রতিফলনের মান কত হবে সেটাই এইবার হিসাব করব।



চিত্র ১৭: মধ্যবর্তী কোণ 180° হলে সর্বোচ্চ 16% পরিমাণ আংশিক প্রতিফলন পাওয়া যাবে। কারণ এইক্ষেত্রে সম্মুখ অংশ এবং পশ্চাৎ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক একই হওয়ায় লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হয় সম্মুখ ও পশ্চাৎ প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের যোগফলের সমান।

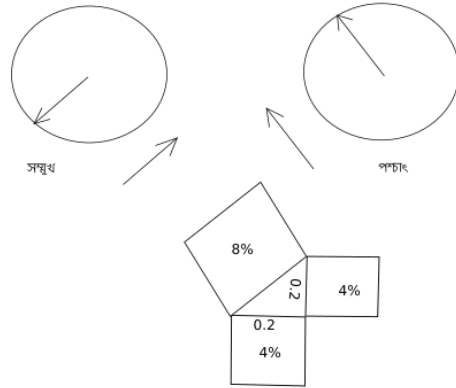
আচ্ছা আমরা কাঁচ ফলকের পুরুত্ব বাড়াতে বাড়াতে যদি এমন একটা পুরুত্ব হয় যেখানে পশ্চাৎ অংশের প্রতিফলনের সময় স্টপওয়াচের কাটা এবং সম্মুখ অংশের প্রতিফলনের সময় স্টপওয়াচের কাটার মধ্যবর্তী কোণ 180° হয়, তখন আংশিক প্রতিফলন কত হবে?



চিত্র ১৮: যখন সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড একে অপরের উপর আপতিত হয় তখন আদতে কোন প্রতিফলনই হয় না।

নিউটন কাচ ফলকের পুরুত্বের সাথে আংশিক প্রতিফলনের যে ধরনের গ্রাফ পেয়েছিলেন আমরা কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে সেই গ্রাফের রহস্য উদঘাটন করতে পেরেছি।

এইবার ছোট্ট একটা প্রশ্ন আমি যদি ৪% আংশিক প্রতিফলন পেতে চাই তাহলে সম্মুখ অংশের প্রতিফলনের সময় স্টপওয়াচের কাটা এবং পশ্চাৎ অংশের প্রতিফলনের সময় স্টপওয়াচের কাটার মধ্যবর্তী কোণ কত হবে? চিত্র-১৯ দিয়ে একটু চিন্তা করে দেখ তো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় কিনা!

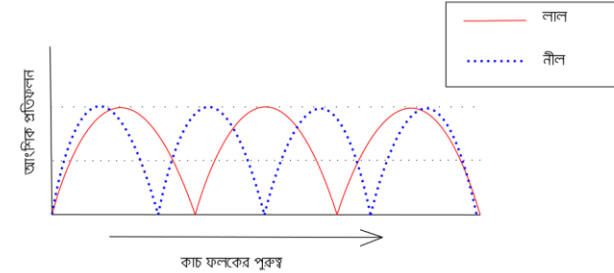


চিত্র ১৯: সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মধ্যবর্তী কোণ কত হলে ৪% আংশিক প্রতিফলন পাওয়া যাবে?

সাবানের বুদবুদ

আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম তা হচ্ছে লাল রঙের আলোক উৎস যদি কাঁচ ফলকের উপর আপতিত হয় তাহলে কাঁচ ফলকের পুরুত্বের উপর নির্ভর করে আংশিক প্রতিফলনের মান ০ থেকে ১৬% পর্যন্ত হতে পারে।

এইবার আমরা লাল রঙের আলোক উৎসের বদলে নীল রঙের আলোক উৎস ব্যবহার করি তাহলে আমরা কেমন গ্রাফ পাব? নীল রঙের জন্য এই উত্থান (০ থেকে ১৬% যাওয়ার সময়) এবং পতন (১৬% থেকে ০% পতনের সময়) আরো দ্রুত হবে।



চিত্র ২০: লাল রঙের আলোর পরিবর্তে নীল রঙের আলো ব্যবহার করলে আংশিক প্রতিফলনের মান খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়। এই দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য। উপরের চিত্র দেখে বলত কোন রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশী?

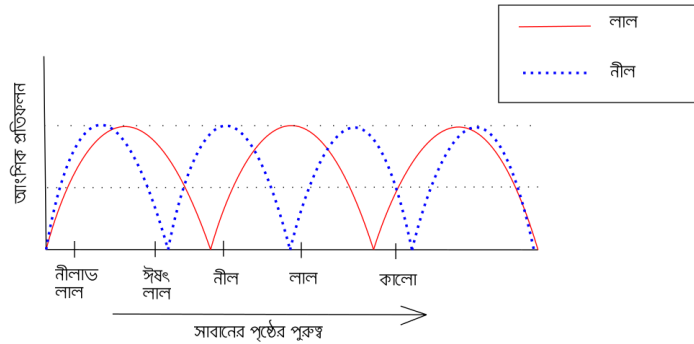
ফলে লাল আলোর জন্য আমরা স্টপওয়াচ দিয়ে যেভাবে আংশিক প্রতিফলন হিসাব করলাম ঠিক সেইভাবে নীল আলোর জন্য হিসাব করতে গেলে স্টপওয়াচের কাটা আরো তাড়াতাড়ি ঘুরবে।

এইটা দিয়ে আসলে কি ব্যাখ্যা করা যায়?

গোসল করার সময় সাবানের বুদবুদ কখনো আলোর দিকে ধরলে আমরা সাবানের বুদবুদের পৃষ্ঠে রঙিন যে আলোকমালা দেখতে পাই তার কারণ হচ্ছে এই গ্রাফ। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা সাবানের বুদবুদের উপর সাদা আলোর পরিবর্তে লাল আলো নিক্ষেপ করি। আমরা দেখব লাল আলোর

পট্টি। আর পাশাপাশি দুইটি লাল আলোর পট্টির মাঝে অন্ধকার। এর কারণ হচ্ছে সাবানের বুদবুদের পুরুত্ব সুষম নয়। ফলে আমরা পুরুত্ব ভেদে 0 থেকে 16% পর্যন্ত প্রতিফলন পাচ্ছি। তার ফলাফল হচ্ছে এই পট্টি। কিন্তু যেখানে কোন প্রতিফলনই হচ্ছে না সেখানটা অন্ধকার। ঠিক একইভাবে যদি লাল আলোর পরিবর্তে নীল আলো দিয়ে একই পরীক্ষাটা করা হয় তখন দেখা যাবে যে, একই রকমের নীল আলোর পট্টি পাচ্ছি কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এইবার পট্টি আরো বেশি পাচ্ছি। এর কারণ হচ্ছে চিত্র-২০ এর মত নীল আলোর খুব দ্রুত পরিবর্তন। এইবার যদি লাল ও নীল আলো একসাথে সাবানের বুদবুদের উপর ফেলা হয় তাহলে দেখা যাবে রঙিন একটা বুদবুদ। মনে হবে হাজার হাজার রং একসাথে ছুট করে সাবানের বুদবুদের উপর হাজির হল।



চিত্র ২১: সাবানের পৃষ্ঠের পুরুত্বের তারতম্যের কারণে পুরুত্বভেদে 0 থেকে 16% পর্যন্ত প্রতিফলন দেখা যায়। সাবানের পৃষ্ঠে নীল ও লাল আলো আপতিত হলে লাল ও নীল রঙের মিশ্রণের ফলে কোথাও লাল, নীল, কোথাওবা ঈষৎ লাল এরকম হরেক রকম রঙ সৃষ্টি হয়। ফলে সাবানের বুদবুদ রঙিন দেখায়।

চিত্র-২১ থেকে খুব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যখন নীল আলোর আংশিক প্রতিফলন 0% এবং লাল আলোর আংশিক প্রতিফলন 16% তখন আমরা লাল রং দেখতে পাব। আবার যে পুরুত্বে নীল আলোর আংশিক প্রতিফলন 16% এবং লাল আলোর আংশিক প্রতিফলন 0% সেখানে আমরা নীল দেখতে পাব। যেখানে লাল ও নীল আলোর আংশিক প্রতিফলন সমান অথবা কম বেশি হয় সেখানে কালো, নীলাভ লাল, ঈষৎ লাল আরও নানা রকম রং দেখা যায়।

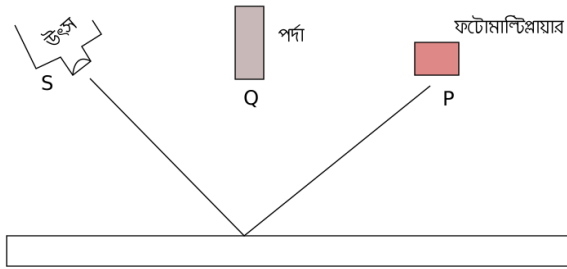
এর কারণ হচ্ছে সাবানের বুদবুদের পৃষ্ঠের পুরুত্ব সুষম নয়। ফলে আমরা এই ধরনের রঙের পট্টি দেখতে পাই।

একটু খেয়াল করে করে দেখ মাত্র দুইটা রং থেকে আমরা কতগুলো রং পেলাম। যেমন সাদা আলোর সাতটা রং-ই সাবানের বুদবুদের উপর আপতিত হবে তখন কতগুলো রং একসাথে তৈরি হবে ভেবে দেখতে পার! ঠিক এইভাবে আমরা যদি পানির মধ্যে তেল ছেড়ে দেই তখন তেলের উপরিপৃষ্ঠে যে রঙের খেলা দেখতে পাই এর কারণও হচ্ছে এই আংশিক প্রতিফলন। তেলের পুরুত্ব সুষম না হওয়ায় আমরা এই ধরনের আলোকমালা দেখতে পাই।

আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান

আমরা বেশ কিছু আলোকীয় ঘটনা স্কুল-কলেজ পর্যায়ের পদার্থবিজ্ঞান বইয়ে পড়েছি। যেমন আলো যেই কোণে কাঁচ ফলকে আপতিত হবে ঠিক সেই কোণে প্রতিফলিত হবে, আলো যখন বায়ু মাধ্যম থেকে কাঁচ মাধ্যমে যায় তখন আলোর গতির দিক বেকে যায়, লেন্স দিয়ে আলোকে একটা বিন্দুতে ফোকাস করা যায়। এইসব যাবতীয় ঘটনা কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এইবার আস্তে আস্তে আমরা একটা একটা করে ঘটনা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

ঠিক আগের মতই একটি লাল রঙের আলোক উৎস দরকার যার তীব্রতা অনেক কম। অর্থাৎ উৎস থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একটি করে ফোটন কণা বের হয়। একটি ফটোমাল্টিপ্লায়ার লাগবে যা আলোক কণাকে ডিটেক্ট করবে। আমরা এই পরীক্ষায় আলোক উৎস এবং ফটোমাল্টিপ্লায়ার একই উচ্চতায় রাখব। আলো যেকোন পথে উৎস হতে ফটোমাল্টিপ্লায়ারে এসে পৌঁছাতে পারে। আলো যাতে সরাসরি ফটোমাল্টিপ্লায়ারে এসে পৌঁছাতে না পারে সে জন্য আমরা আলোক উৎস এবং ফটোমাল্টিপ্লায়ারের মাঝখানে একটা পর্দা রাখি।



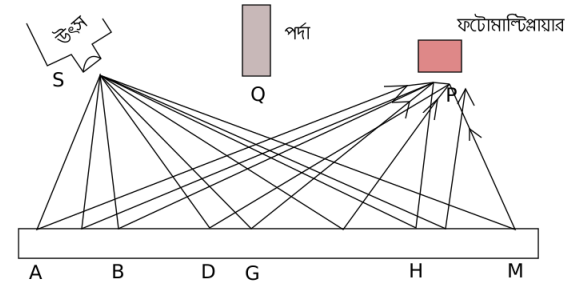
চিত্র ২২: আলো উৎস থেকে যে কোন পথে কাঁচ ফলকে আপতিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ারে পৌঁছাতে পারে। আলো উৎস থেকে সরাসরি যাতে ফটোমাল্টিপ্লায়ারে এসে না পড়ে সে জন্য উৎস ও ফটোমাল্টিপ্লায়ারের মাঝখানে একটা পর্দা রাখা হয়েছে।

এখন উৎস থেকে যখন আলো নির্গত হবে তখন আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেই যে আলো ঠিক মাঝখানে এসে আপতিত হবে, তারপর সেখান

থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার P তে এসে পৌঁছাবে। কিন্তু আগেই বলেছি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে সব হচ্ছে সম্ভাবনা।

উৎস “S” হতে আলো ফটোমাল্টিপ্লায়ারে যেকোন পথে আসতে পারে। আমাদের এই সবগুলো পথের সম্ভাবনা হিসাব করতে হবে। তারপর এই সম্ভাবনা যোগ করে একটি লম্বি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড বের করার পর বলতে পারব আলো উৎস S হতে ফটোমাল্টিপ্লায়ার P তে আসার পরিমাণ কত।

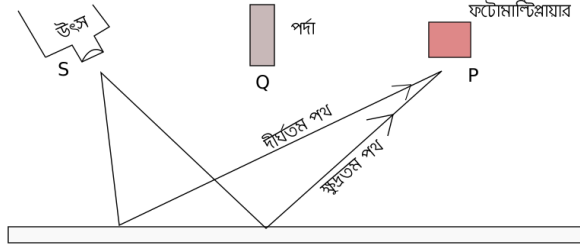
তাহলে কি কি পথে উৎস S হতে ফটোমাল্টিপ্লায়ার P তে আলো আসতে পারে তার জন্য একটা চিত্র আঁকি। (চিত্র-২৩)



চিত্র ২৩: আলো কাঁচ ফলকের যে কোন বিন্দুতে আপতিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার P তে পৌঁছাতে পারে। চিত্র-২৩ এ আলো উৎস S হতে কাঁচ ফলকের A, B, D, G, H ও M বিন্দুতে আপতিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার P তে পৌঁছায়। আমরা এরকম অল্প কয়েকটি বিন্দু দিয়ে আলোর প্রতিফলন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

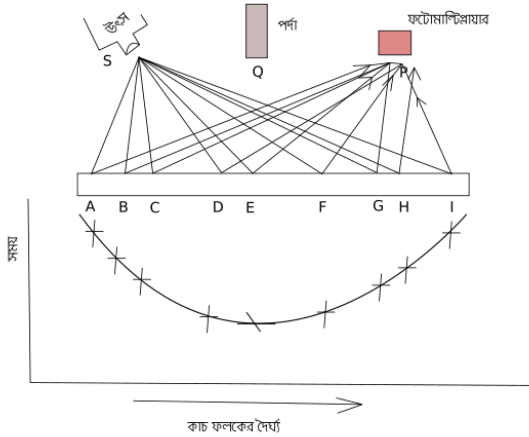
কোয়ান্টাম মেকানিকস অনুযায়ী আলো উৎস S হতে যে কোন পথে ডিটেক্টর P তে যাওয়ার সম্ভাবনা সমান। আলো A থেকে M দৈর্ঘ্যের কাঁচ ফলকের যে কোন অংশে প্রতিফলিত হয়ে P তে আসতে পারে।

এইবার আমরা প্রতিটি পথের জন্য সম্ভাবনা হিসাব করব প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে। যেহেতু আলোর যে কোন পথে যাওয়ার সম্ভাবনা সমান, তাই প্রতিটি পথের জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দৈর্ঘ্য সমান এবং এর দিক হিসাব করার জন্য আগের মতই স্টপওয়াচ নেই। যেহেতু পথের দৈর্ঘ্য সর্বত্র সমান নয়, তাই স্টপওয়াচের কাটার দিক ভিন্ন হবে পথের দৈর্ঘ্যের তারতম্যের কারণে।



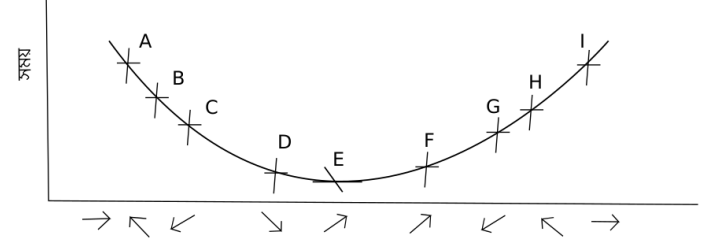
চিত্র ২৪: আলো কাঁচ ফলকের যেকোন অংশে আপতিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার P তে পৌঁছাতে পারে। যে কোন দৈর্ঘ্যের আলোক পথের জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান একই হবে কিন্তু পথের দৈর্ঘ্যের তারতম্যের কারণে দিক ভিন্ন ভিন্ন হবে। চিত্র-২৪ এ SAP ও SGP দুইটি আলোক পথ দেখানো হয়েছে। একটি দীর্ঘতম পথ ও অপরটি ক্ষুদ্রতম পথ হওয়া সত্ত্বেও দুইটি পথের জন্যই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দৈর্ঘ্য একই হবে কিন্তু দিক ভিন্ন হবে কারণ ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্য স্টপওয়াচে অতিবাহিত সময় ভিন্ন হবে।

আমরা এবার পথের দৈর্ঘ্যের তারতম্যের জন্য স্টপওয়াচের অতিবাহিত সময় হিসাব করব।



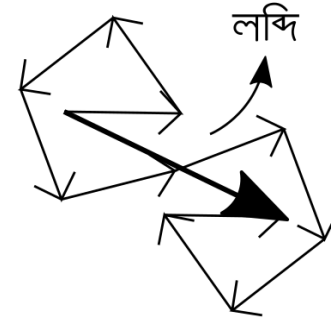
চিত্র ২৫: আলোকরশ্মি কাঁচ ফলকের উপর আপতিত হয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ার P-তে পৌঁছায়। আলোকরশ্মি যখন A তে পৌঁছায় তখন সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করে। প্রান্তবিন্দু A থেকে মধ্যবিন্দু E পর্যন্ত ধীরে ধীরে সময় কমতে থাকে। আলোকরশ্মি যখন অপর প্রান্তবিন্দু I এর দিকে আপতিত হতে থাকে তখন সময় আবারও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। চিত্র-২৫ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আলোকরশ্মি যখন প্রান্তের দিকে (A, B, C, G, H, I) আপতিত হয় তখন সময় বেশি নেয় মধ্যবিন্দুর আশেপাশে (D, E, F) আপতিত হলে সময় কম নেয়।

চিত্র-২৫ থেকে দেখা যাচ্ছে SAP সবচেয়ে দীর্ঘ। ফলে এখানে সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত হবে। মাঝামাঝি বিন্দু E অথবা F এ সময় সবচেয়ে কম অতিবাহিত হবে। আবার যখন অপর প্রান্তবিন্দু H, I এর দিকে যেতে থাকবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ায় এইখানেও বেশি সময় অতিবাহিত হবে। ফলে সময়ের সাথে পথের লেখচিত্র হবে চিত্র-২৫ এর মত। যেহেতু সময় ভিন্ন তাই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক ভিন্ন হবে। কাছাকাছি বিন্দুতে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক কাছাকাছি থাকবে।



চিত্র ২৬: প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিকসহ সময়ের গ্রাফটা হবে উপরের চিত্রের মত। দুই প্রান্তে (A, B, C, এবং G, H, I) আলো একই সময় অতিক্রম করায় প্রান্তবিন্দুদ্বয়ের দিকে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক একই থাকে।

চিত্র-২৬ এ একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, আলো দুইপ্রান্তে একই পথ অতিক্রম করে ফলে অতিক্রান্ত সময় সমান হয়। ফলে প্রান্তের দিকে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড অ্যামপ্লিটিউডের দিক একই (A, B, C এবং G, H, I) হয়। এইবার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডগুলো একটার পর একটা বসালে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড বের করা যাবে।



চিত্র ২৭: একটার পর একটা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড বসালে A এর পুচ্ছ থেকে I এর শীর্ষ যোগ করলে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যাবে। লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে মাঝের বিন্দুগুলো (D, E, F)। D, E, F বিন্দুত্রয়ের লব্ধির দিক এবং পুরো ঘটনার লব্ধির দিক প্রায় একই। অন্যদিকে প্রান্ত

বিন্দুগুলোর লব্ধির দিক একে অপরের বিপরীত ফলে এরা একে অপরকে নাকচ করে। (চিত্র-২৭ ক এবং খ)। ঠিক এই কারণেই আলো ঠিক মাঝখানে আপতিত হয়।

চিত্র-২৭ এর দিকে একটু ভালভাবে তাকালে বুঝা যাবে যে, A, B, C এর লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক অপর প্রান্তবিন্দুত্রয় G, H, I এর লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের বিপরীত দিকে। ফলে প্রান্তের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড একে অপরকে নাকচ করে দেয়। চিত্র-২৭ খ।

ফলে মাঝের বিন্দুগুলো D, E, F এর লব্ধি পুরো ঘটনার লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে। চিত্র-২৭ ক।

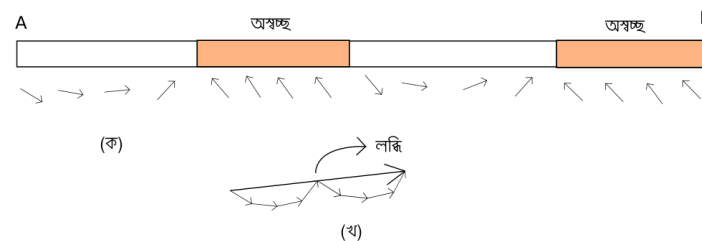
চিত্র ২৫ এবং চিত্র-২৬ এ আমরা দেখেছি আলো মাঝ বরাবর আপতিত হলে সবচেয়ে কম সময় নেয়। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে আমরা দেখলাম মাঝের বিন্দুগুলোর প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে।

যে কোন দন্ডের মধ্যবিন্দু থেকে প্রান্তদ্বয়ের দূরত্ব সমান। ফলে আলো মধ্যবিন্দুতে আপতিত হতে যে সময় নেয়, প্রতিফলিত হতে ঠিক একই সময় নেয়। এই কারণেই আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সমান হয়।

অদ্ভুত! তাই না? আমরা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়েই বের করে ফেলতে পারি আলো কেন মাঝ বরাবর আপতিত হয় এবং কিভাবে আলোর আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সমান হয়। যারা এতটুকু পড়েছ তারা হয়ত বলবে এটা তো ক্যালকুলাস দিয়েও করা যায়। ঠিক তাই! তবে সে গল্প আরেক দিন।

অপবর্তন গ্রেটিং ও রংধনু

এইবার আমরা কাঁচের কিছু কিছু জায়গায় অস্বচ্ছ করে দেই। আমরা খুঁজে খুঁজে কাঁচ ফলকের ঐ অংশ অস্বচ্ছ করব যেখানে আলোকরশ্মির প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক একই।



চিত্র ২৮: (ক) কাঁচ ফলকের কিছু অংশ অস্বচ্ছ করা হল। যে অংশে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক প্রায়ই একই থাকে সেই অংশ অস্বচ্ছ করা হল। (খ) স্বচ্ছ অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে একটা বড়সড় লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া গেল।

এইবার স্বচ্ছ অংশগুলোর প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড একটার পর একটা বসালে একটা লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যাবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই কাঁচ ফলকের কিছু অংশ অস্বচ্ছ হওয়ার কারণে আমরা বড়-সড় কোন প্রতিফলন আশা নাই করতে পারি। কিন্তু চিত্র-২৮ খ হতে এটা স্পষ্ট যে বেশ বড় মানের একটা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া গেল। এটাই আবর্তন গ্রেটিং।

আলো সরল রেখায় চলে এমন একটা ধারণা পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিন্তু দেখা যায় আলোক পথ বরাবর কোন বাধা থাকলে পেছনে যে ছায়া পড়ে সেটা খুব অন্ধকার না হয়ে কিছুটা উজ্জ্বল থাকে। এর কারণ হচ্ছে অপবর্তন।

চিত্র-২৮ এ দেখ প্রায় একই রকম একটা কাজ করেছে। কিছু অংশ অস্বচ্ছ করে দিয়ে আলোর চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে দিয়েছি কিন্তু তারপরও আমরা বেশ বড়সড় একটা প্রতিফলন পেলাম।

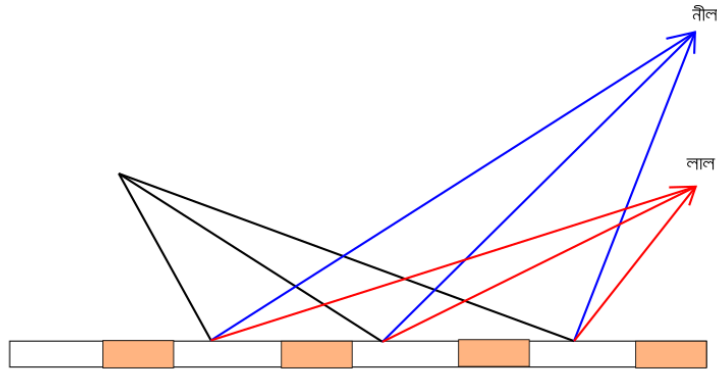
এই অপবর্তন গ্রেটিং ব্যবহার করা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে। নক্ষত্র কি কি উপাদানে তৈরি তা জানতে। নক্ষত্রের রাসায়নিক উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার

কারণে বর্ণালী ভিন্ন হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণালী যখন অপবর্তন গ্রেটিং এ নিষ্ক্ষেপ করা হয় তখন বর্ণালীগুলো আলাদা হয়ে যায়।

লাল রঙের আলো যখন অপবর্তন গ্রেটিং এ নিষ্ক্ষেপ করা হবে তখন লাল আলো প্রতিফলিত হয়ে একসাথে পট্ট গঠন করবে। নীল রঙের আলো যখন অপবর্তন গ্রেটিং এ নিষ্ক্ষেপ করা হবে তখন নীল আলো প্রতিফলিত হয়ে একসাথে পট্ট গঠন করবে।

একটু দেখা যাক ব্যাপারটা কিভাবে হয়। লাল রঙের পরিবর্তে নীল রঙের আলো ব্যবহার করে অপবর্তন গ্রেটিং বানাতে হলে কাচ ফলকের অস্বচ্ছ অংশের অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে। কারণ আমরা আগেই দেখেছি নীল রঙের আলোর জন্য স্টপওয়াচ খুব দ্রুত ঘুরবে। কিন্তু আমরা যদি লাল রঙের জন্য ব্যবহৃত অপবর্তন গ্রেটিং ব্যবহার করি তাহলে কি হবে?

লাল রঙের আলো ব্যবহার করার সময় ফটোমাল্টিপ্লায়ার এবং উৎস একই উচ্চতায় রাখা হয়েছিল। এইবার নীল আলোক উৎসের জন্য ফটোমাল্টিপ্লায়ার একটু বেশি উচ্চতায় রাখব। যেহেতু নীল আলো খুব দ্রুত পরিবর্তন হয় ফলে লাল আলোর জন্য ব্যবহৃত অপবর্তন গ্রেটিং ব্যবহার করতে হলে দূরত্ব বাড়াতে হবে। ফলে লাল আলো ও নীল আলো আলাদা হয়ে যাবে।

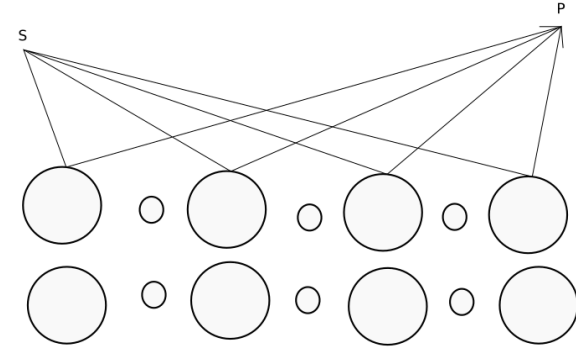


চিত্র ২৯: লাল ও নীল আলো উভয়ের জন্য একই অপবর্তন গ্রেটিং ব্যবহার করা হলে ফটোমাল্টিপ্লায়ারের উচ্চতা ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে। ফলে নীল আলো ও নীল আলো আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে হলুদ, সবুজ আলোর প্রতিফলন আলাদা করা সম্ভব। আচ্ছা বলত হলুদ ও সবুজ আলোর প্রতিফলন পেতে হলে কোথায় ফটোমাল্টিপ্লায়ার রাখতে হবে?

ঠিক এইভাবে হলুদ, সবুজ আলোর জন্য পরীক্ষাটা করলে দেখা যাবে হলুদ, সবুজ আলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আমরা আকাশে যে রংধনু দেখি ঠিক

এইভাবে দেখি। এইখানে কাচের বদলে থাকে আকাশ এবং এই আকাশ অপবর্তন গ্রেটিংয়ের কাজ করে।

স্কুল-কলেজ পর্যায়ে পদার্থ বা রসায়নবিজ্ঞান পড়ার সময় লবনের কেলাস গঠন পড়ে থাকার কথা। এই কেলাসের গঠন নির্ণয়কে বলা হয় ক্রিস্টালোগ্রাফি। এইখানেও অপবর্তন গ্রেটিং দিয়ে স্ফটিকের গঠন নির্ণয় করা হয়।

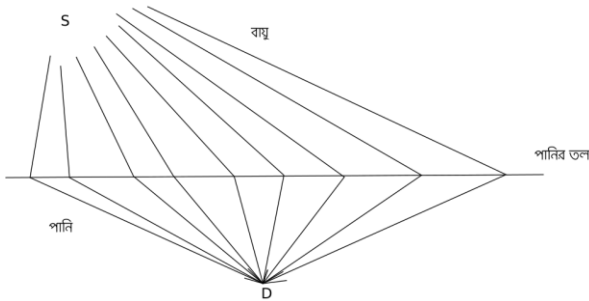


চিত্র ৩০: কেলাসের গঠন নির্ণয়ের সময় কেলাসের উপর রঞ্জন রশ্মি নিষ্ক্ষেপ করা হয়। ফলে পরমানুর আকারের উপর নির্ভর করে রঞ্জন রশ্মি আলাদা হয়ে যায়। চিত্র-৩০ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ভিন্ন ভিন্ন আকারের পরমানুর উপর আপতিত আলো আলাদা হয়ে যাবে এবং এই প্রতিফলিত আলো ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় রাখা ফটোমাল্টিপ্লায়ারে ধরা পড়ে।

ক্রিস্টালোগ্রাফিতে আলোক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় রঞ্জন রশ্মি। পরমানুর আকারের ভিন্নতার জন্য প্রতিফলন আলাদা হয়ে যায়। এই প্রতিফলিত আলো নিরীক্ষণ করেই স্ফটিকের গঠন নির্ণয় করা হয়।

আলোর প্রতিসরণ

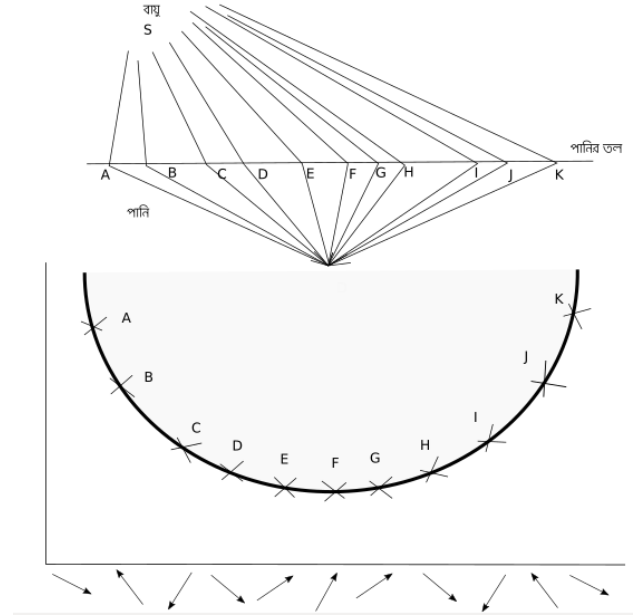
আমরা দেখেছি আলো একটা মাধ্যমের তলে আপতিত হলে কিভাবে প্রতিফলিত হয়। এখন আমরা দেখব আলো কিভাবে এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যায়। আলো এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যাওয়ার সময় পথ পরিবর্তন করে। কেন এই পরিবর্তন হয় তা কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আলোর প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করার জন্য দুইটি মাধ্যম প্রয়োজন। ধরি দুইটি মাধ্যম হচ্ছে বায়ু মাধ্যম এবং পানি মাধ্যম। আলো বায়ু থেকে পানিতে যাচ্ছে। পানিতে একটা ফটোমাল্টিপ্লায়ার রাখা হল যেটা পানিতে আলো ডিটেক্ট করবে। যেহেতু কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে আলোর প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করতে চাই তাই আমরা হিসাব করব আলো উৎস থেকে ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আসার সম্ভাবনার পরিমাণ। এই পরিমাণ হিসাব করার জন্য আলো সম্ভাব্য যে যে পথে উৎস থেকে ফটোমাল্টিপ্লায়ারে যেতে পারে তা চিত্র-৩১ এ দেখানো হল-



চিত্র ৩১: আলো বায়ু থেকে পানিতে আসার সময় সম্ভাব্য যে যে পথে উৎস হতে ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আসতে পারে তা দেখানো হল।

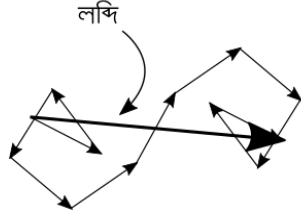
আমরা এই সম্ভাবনা পূর্বের মতই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে হিসাব করব। যেহেতু আলো উৎস থেকে ফটোমাল্টিপ্লায়ার D তে যাওয়ার জন্য প্রতিটি পথের সম্ভাবনা সমান তাই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দৈর্ঘ্য সমান। আর এই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক হিসাব করার জন্য আমরা একটা

স্টপওয়াচ নিব। আর প্রতিটি পথের জন্য কতটুকু সময় লাগে তার উপর নির্ভর করে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক অংকন করব। তাহলে সময়ের সাথে ফটোমাল্টিপ্লায়ার ও উৎসের দূরত্বের উপর নির্ভর করে লেখচিত্র অংকন করলে আমরা প্রতিফলনের মতই লেখচিত্র পাব।



চিত্র ৩২: আলো বায়ু থেকে পানিতে সম্ভাব্য যে যে পথে গমন করতে পারে সেগুলোর প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিকসহ সময়ের সাথে গ্রাফ অংকন করলে দেখা যায় যে, আলো J, L, N পথে কম সময় নেয়। A, B, C, D এবং P, Q, R, S বিন্দুতে আপতিত হয়ে পানিতে যাওয়ার সময় বেশি সময় নেয়।

এইবার আমরা এই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড একটার পর একটা বসিয়ে যদি লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড বের করি তাহলে দেখব প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক প্রায় একই সেই অংশ লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে। বাকী অংশগুলো একে অপরকে নাকচ করে দেয় এবং চিত্র-৩২ থেকে এটা স্পষ্ট যেখানে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক প্রায় এক সেখানে সময় সর্বনিম্ন। ফলে আলো উৎস থেকে পানিতে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আসার সময় ঐ পথেই আসবে।

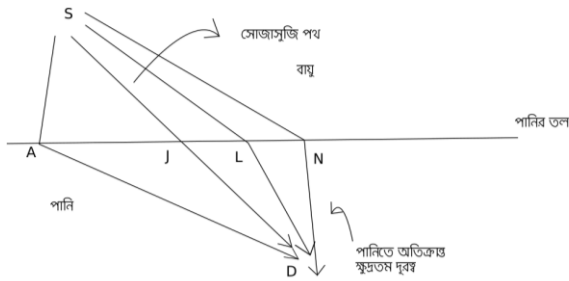


চিত্র ৩৩: সম্ভাব্য পথের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড একটার পর একটা বসালে যে লন্দি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যায় তার দিক এবং আলো J , L , N বিন্দুতে আপতিত হয়ে পানিতে যাওয়ার সময় যে লন্দি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যায় তার দিক প্রায় এক। ফলে আলো মাঝামাঝি কোন একটা বিন্দুতে আপতিত হবে।

চিত্র-৩৩ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বায়ু মাধ্যমে অবস্থিত উৎস থেকে আলো পানিতে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আসার সময় মাঝামাঝি একটি পথ দিয়ে গমন করবে কারণ আলো ঐ পথে আসতে সর্বনিম্ন সময় নেয়।

এইবার একটু বুঝার চেষ্টা করি, কেন আলো মাঝামাঝি কোন পথে আপতিত হলে সর্বনিম্ন সময় নেয়। আলো যখন বায়ু ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে চলাচল করে তখন তার বেগ কমে যায়। তাই আলো পানি মাধ্যমে চলার সময় এমন একটা পথ গ্রহণ করতে চায় যে পথে আলোকে পানিতে সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়।

একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। একজন ডুবুরী দেখল এক বালক সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় ডুবে যাচ্ছে। ডুবুরী S অবস্থান থেকে বালকটিকে বাঁচানোর জন্য যাত্রা শুরু করবে এবং বালকটি D অবস্থানে ডুবে যাচ্ছে।



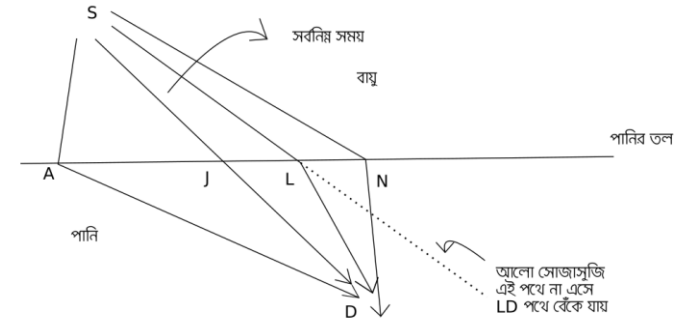
চিত্র ৩৪: ডুবুরী বালকটিকে বাঁচাতে হলে কোন পথে গেলে সে বালকটিকে বাঁচাতে পারবে? উত্তর হচ্ছে যে পথে সবচেয়ে কম সময় নেবে। চিত্র-৩৪ থেকে দেখা যাচ্ছে SAD পথ সবচেয়ে দীর্ঘ। SJD সোজাসুজি পথ। পানিতে ডুবুরীর বেগ কমে যাওয়ায় SND পথে গেলে পানিতে ডুবুরীকে সবচেয়ে কম পথ অতিক্রম করতে হবে। তবে স্থলে অতিক্রান্ত পথ বেশি হওয়ায় SND পথও গ্রহণযোগ্য নয়। SJD এবং SND এর মাঝামাঝি কোন পথে গেলে ডুবুরী বালককে বাঁচাতে পারবে।

ডুবুরী যদি বালককে বাঁচাতে চায় তাহলে কিভাবে বালকের কাছে পৌঁছাতে পারে। ডুবুরী সমুদ্র পাড়ে যে গতিতে দৌড়াবে পানিতে সাঁতার কাটার সময় কিন্তু সে গতিতে ছুটতে পারবে না অবশ্যই গতি কম হবে। এখন সে যদি SAD পথে বালককে উদ্ধার করতে চায় তাহলে তাকে অনেক লম্বা একটা পথ পাড়ি দিতে হবে, ততক্ষণে কিন্তু বালক ডুবে যাবে।

SJD পথ সোজাসুজি। যে কোন সোজাসুজি পথে দূরত্ব সবচেয়ে কম। এখানে দূরত্বে বলতে সমুদ্রপাড়ে অতিক্রান্ত এবং পানিতে অতিক্রান্ত দূরত্বের যোগফল বোঝানো হয়েছে। এই সোজাসুজি পথে ডুবুরীকে পানিতে বেশ লম্বা একটা পথ পাড়ি দিতে হবে। পানিতে ডুবুরীর বেগ কম হওয়ায় এই পথও গ্রহণযোগ্য নয়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ডুবুরী এমন একটা পথে ছুটা শুরু করে যে পথে পানিতে অতিক্রান্ত দূরত্ব সবচেয়ে কম। SND পথে ডুবুরী ছোট্টা শুরু করলে পানিতে অতিক্রান্ত অংশ কম হলেও তাকে সমুদ্র পাড়ে SJD এর বেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

ফলে এটা বুঝা যাচ্ছে SJD পথে পানিতে অতিক্রান্ত দূরত্ব বেশি এবং SND পথে সমুদ্র পাড়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব বেশি। ফলে সবচেয়ে কম সময় লাগবে যদি ডুবুরী SJD এবং SND এর মাঝামাঝি কোন পথ যেমন SLD দিয়ে বালকের কাছে পৌঁছায়।

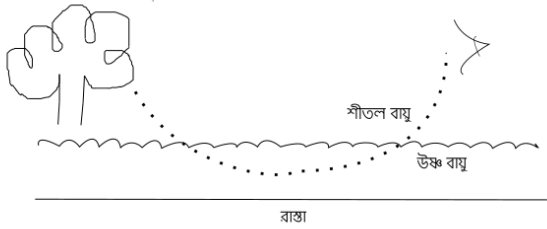
চিত্র-৩৪ এ একটু লক্ষ্য করি SLD পথের LD অংশটা কিন্তু SL অংশ থেকে বাঁকা। অর্থাৎ আলো যখন মাধ্যম পরিবর্তন করে তখন সে এমন একটা পথ বেছে নেয় যে পথে আলোর অতিক্রান্ত সময় সবচেয়ে কম হবে— ফলে আলোর গতিপথ বেকে যায়। এই ঘটনা হচ্ছে প্রতিসরণ।



চিত্র ৩৫: SJD সোজাসুজি পথ। ফলে মোট দূরত্ব কম কিন্তু পানিতে অতিক্রান্ত পথ বেশি। পানিতে আলোর বেগ কম হওয়ায় আলো এই পথ গ্রহণ করে না। পানিতে অতিক্রান্ত দূরত্ব সবচেয়ে কম SND পথে। কিন্তু স্থলে অতিক্রান্ত দূরত্ব বেশি হওয়ায় এই পথেও বেশ সময় লাগে। আলো সবচেয়ে কম সময়ে D তে পৌঁছাবে যদি SLD পথে যায়। লক্ষণীয় ব্যাপার

হচ্ছে SLD পথের LD অংশ SL অংশ থেকে বঁাকা। ফলে সবচেয়ে কম সময়ে মাধ্যম অতিক্রম করার কারণে আলোর গতিপথ বেঁকে যায়।

গ্রীষ্মের প্রখর রোদে ঢাকার পিচ ঢালা রাস্তা মাঝে মাঝে ভেজা ভেজা মনে হয় যেন কিছু প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে তার কারণ এই প্রতিসরণ। এই ধরনের ঘটনা অবলোকন করতে হলে চোখ অবশ্যই বায়ুর শীতলতর অংশে থাকতে হবে। প্রচণ্ড গরমে পিচ ঢালা রাস্তা সংলগ্ন বায়ু খুব গরম থাকে। ফলে এই উষ্ণ গরম বায়ু অংশে আলোর বেগ বেশি থাকে। ফলে রাস্তার পাশের সারি সারি লাগানো গাছ থেকে নির্গত আলো শীতলতর বায়ু তারপর গরম পিচ ঢালা সংলগ্ন উষ্ণ বায়ু হয়ে আবার বায়ুর শীতলতর অংশে অবস্থিত চোখে প্রবেশ করে। মনে হয় যেন গাছের বিম্ব রাস্তায় পড়েছে। এটাই মরীচিকা। মরুর রোদে এই ঘটনাটা অহরহ ঘটে ফলে খুব সহজেই বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়। মরীচিকা কিন্তু মেরু অঞ্চলের প্রচণ্ড বরফশীতল আবহাওয়ার মধ্যেও হয়। কেউ কি বলতে পার, মেরুতে মরীচিকা দেখতে হলে চোখের অবস্থান কোথায় হবে?

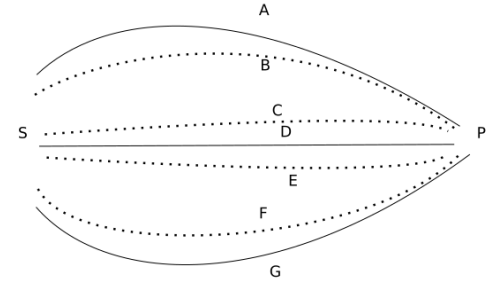


চিত্র ৩৬: মরীচিকা দেখতে হলে চোখ বায়ুর শীতলতর অংশ থাকতে হবে। ফলে উৎস থেকে নির্গত আলো বায়ুর উষ্ণ অংশে আপতিত হয়ে আবার শীতলতর অংশে অবস্থিত চোখে পৌঁছায়। ফলে উৎসের একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

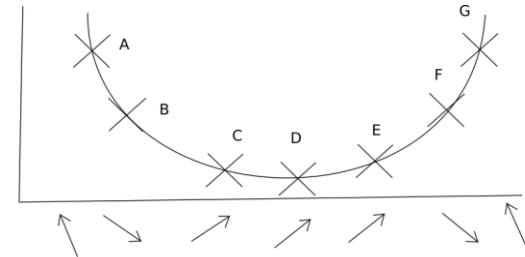
আলোর সরল গরল পথ

আমরা একটা কথা প্রায়ই শুনি- আলো সরল পথে যায়। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করব আলো কি আসলেই সরলপথে যায়?

প্রথমে S বিন্দুতে আলোকে উৎস এবং P বিন্দুতে উৎসের বরাবর একটি ফটোমাল্টিপ্লায়ার রাখি। S থেকে P বিন্দুতে আলোক পথের সম্ভাব্য সবগুলো পথ চিত্র-৩৭ এ দেখানো হলো।

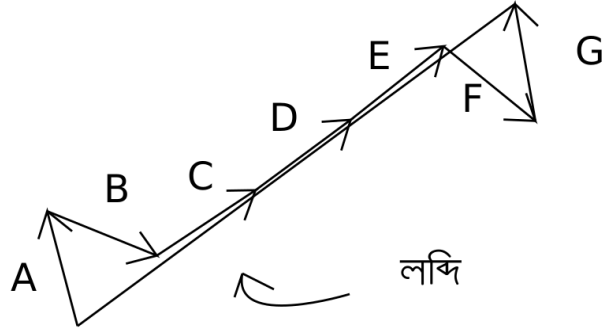


চিত্র ৩৭: আলোক উৎস S হতে আলো যে কোন পথে P তে পৌঁছাতে পারে। উৎস থেকে আলোর সম্ভাব্য পথগুলো দেখানো হল।



চিত্র ৩৮: সম্ভাব্য পথগুলো দিয়ে আলোর অতিবাহিত সময়ের গ্রাফ প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউসসহ অঙ্কন করা হল। A, B পথের দৈর্ঘ্য বেশী হওয়ায় সময় বেশী অতিবাহিত হবে, C, D, E পথ সোজাসুজি হওয়ায় সময় কম অতিক্রান্ত হবে। F, G পথের দৈর্ঘ্য বেশী হওয়ায়, এই পথও আলো বেশী সময় নিয়ে অতিক্রম করবে।

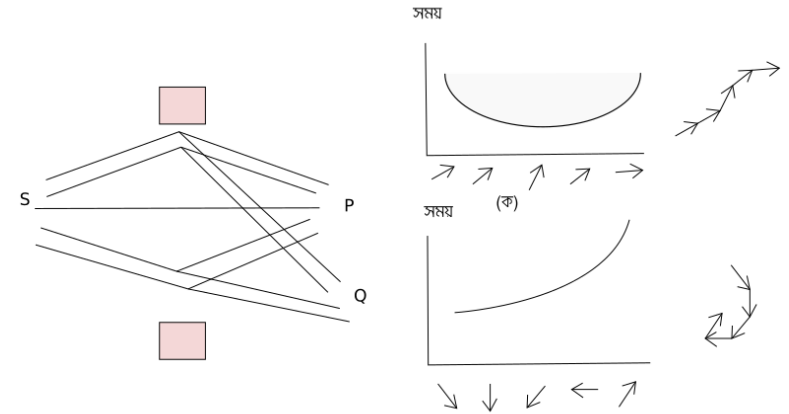
সম্ভাব্য পথ দিয়ে আলোর অতিবাহিত সময় হিসাব করার জন্য একটি স্টপওয়াচ নেই। চিত্র-৩৮ এর মত সময়ের সাথে আলোর অতিক্রান্ত দূরত্বের গ্রাফ পাব। সবগুলো পথের সম্ভাবনা সমান হওয়ায় প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দৈর্ঘ্য একই হবে এবং অতিবাহিত সময়ের পার্থক্য থাকায় দিক ভিন্ন হবে। A, B এবং F, G পথে আলো একই সময়ে অতিক্রম করায় প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক একই হবে। প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড একটার পর একটা বসালে যে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাব তা গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে C, D, E পথের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড। কারণ এই বিন্দুগুলোর প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড একই দিকে থাকে।



চিত্র ৩৯: চিত্র-৩৮ থেকে পাওয়া প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড একটার পর একটা বসালে যে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যায় সেটা গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে C, D, E অংশের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড। পুরো ব্যাপারটাই আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণের মত।

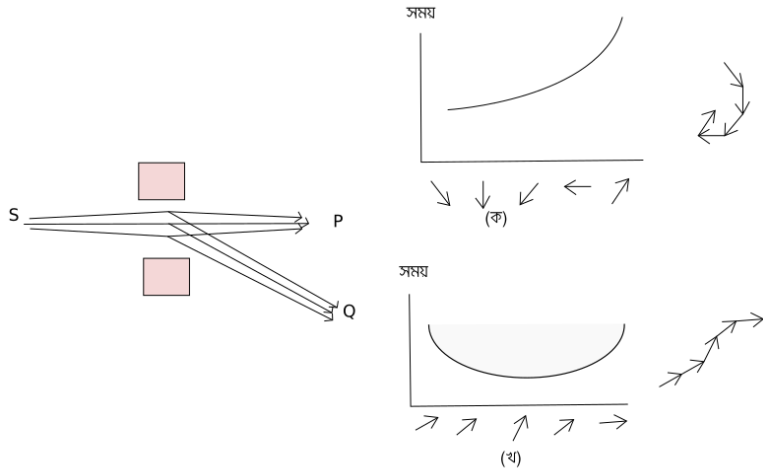
একটা ব্যাপার খুবই লক্ষণীয়, যে কোন আলোকীয় ঘটনায় আলো খুজে খুজে ঐ পথই বেছে নেয় যেই পথ অতিক্রম করতে সবচেয়ে কম সময় লাগে। চিত্র-৩৮ এবং চিত্র-৩৯ এ আরো একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে আলো কিন্তু সোজাসুজি একটি পথেই যায় না। যেমন চিত্র-৩৭ এবং চিত্র-৩৮ এটা স্পষ্ট যে D পথ সবচেয়ে সোজাসুজি এবং আলো এই পথে গেলে সবচেয়ে কম নিবে। কিন্তু আলো শুধুমাত্র D পথ দিয়েই ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আপতিত হয় না— আলো সোজাসুজি পথ D এর কাছাকাছি যে পথগুলো আছে যেমন C, E পথ দিয়ে ফটোমাল্টিপ্লায়ারে আপতিত হয়। এটা হচ্ছে আলোক পথের কোর। এইবার এই কোর নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাক।

উৎস S এবং ফটোমাল্টিপ্লায়ার P এর দুইপাশে দুইটি ব্লক রাখি যাতে আলো ছড়িয়ে না পড়ে অর্থাৎ আলো যাতে দূরতম পথ দিয়ে P তে না পৌঁছে। P বিন্দুর নিচে আরেকটা ফটোমাল্টিপ্লায়ার রাখা হল।



চিত্র ৪০: উৎস এবং ফটোমাল্টিপ্লায়ারের দুই পাশে দুইটি ব্লক রাখা হল। ব্লক দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব একটু বেশি হওয়ায় আলো P তে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্লায়ারে পৌঁছায়। চিত্র-৪০ (ক) থেকে এটা স্পষ্ট যে P তে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্লায়ারের জন্য লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দৈর্ঘ্য Q তে অবস্থিত ফটোমাল্টিপ্লায়ারের জন্য লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী চিত্র-৪০ (খ)। ফলে আলো P বিন্দুতেই আপতিত হয়।

চিত্র-৪০ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ব্লক দুইটির মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব থাকায় আলো মাঝামাঝি যতগুলো সম্ভাব্য পথ আছে সবগুলো দিয়েই। P বিন্দুতে পৌঁছে। যেহেতু S থেকে Q বিন্দুর দূরত্ব বেশী। তাই Q বিন্দুতে আলোকরশ্মি পৌঁছাতে বেশী সময় নেওয়ায় তার লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড খুব কম হয় (চিত্র-৪০ (খ))। ফলে আলো Q বিন্দুতে পৌঁছায় না বললেই চলে। কেউ কি বলতে পার Q বিন্দুতে আলো আসতে হলে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? কিছুই না। ব্লক দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কমাতে হবে। এইবার যদি ব্লক দুইটির দূরত্ব কমানো শুরু করি তাহলে দেখব Q বিন্দুতেও আলো পৌঁছানো শুরু করেছে।

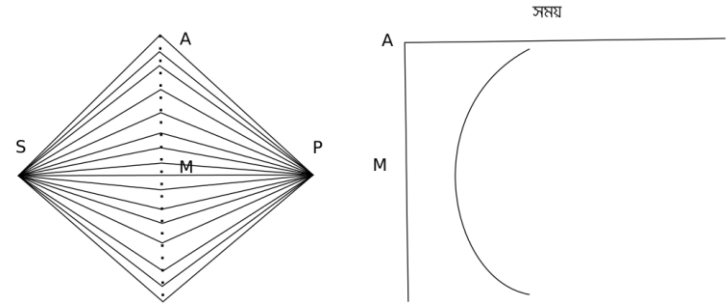


চিত্র ৪১: ব্লক দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কমানো শুরু করলে Q বিন্দুতে আলো পৌঁছায়। (ক) এবং (খ) পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট যে Q এর লম্বি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান P এর চেয়ে বেশী।

আসলে আলোকে অল্প বা সংকীর্ণ পথ দিয়ে যেতে বাধ্য করা হলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আলো Q বিন্দুতে আসতে পারে এবং Q বিন্দুতে আলোর লম্বি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড বৃদ্ধি পায়।

লেন্স তৈরি

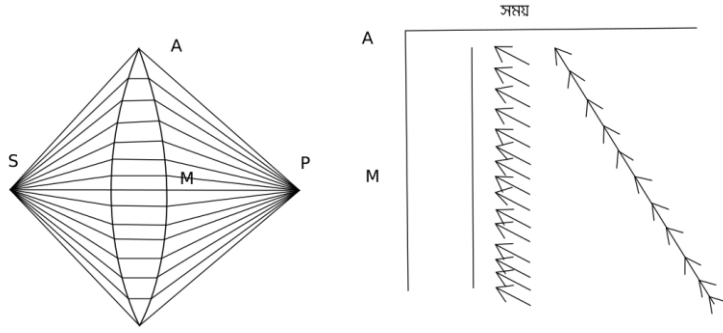
এবার কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে লেন্স তৈরির কৌশলটা দেখা যাক। উৎস S থেকে আলোক রশ্মি ফটোমাল্টিপ্লায়ার P তে পৌঁছানোর সম্ভাব্য পথগুলো দেখানো হল। (চিত্র-৪২)



চিত্র ৪২: উৎস S থেকে আলো সম্ভাব্য যে যে পথে P বিন্দুতে আপতিত হয় তা দেখানো হল। প্রতিটি সম্ভাব্য পথের জন্য অতিবাহিত সময় উল্লম্বভাবে পাশে দেখানো হল। SMP পথ সোজাসুজি হওয়ায় আলো সবচেয়ে কম সময়ে অতিবাহিত হয়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই SAP পথ দীর্ঘ হওয়ায় এখানে অতিক্রান্ত সময় সবচেয়ে বেশী হবে এবং SMP পথে অতিক্রান্ত সময় সবচেয়ে কম হবে।

আমরা এইবার আলোকে একটু বোকা বানানোর চেষ্টা করি। যেহেতু কেন্দ্র SMP থেকে যত দূরে যাব তত বেশি সময় লাগবে এখন আমরা এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করব যাতে SMP পথে অতিক্রান্ত সময় এবং SAP পথে অতিক্রান্ত সময় সমান হয় অর্থাৎ আলোর প্রতিটি পথ অতিক্রম করতে যাতে একই সময় লাগে। আমরা জানি কাঁচের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর বেগ কমে যায়। এখন চিত্র-৪২ এর যে অংশে আলোর অতিক্রান্ত সময় কম সেখানে যদি কাঁচের পুরুত্ব বেশি এবং যে অংশে আলোর অতিক্রান্ত সময় বেশি সেখানে কাঁচের পুরুত্ব কম করে দেয়া যায় তখন দেখা যাবে প্রতিটি পথ অতিক্রমে আলোর একই সময় লেগেছে।



চিত্র ৪৩: লেন্স তৈরির সময় আলোকে একটু বোকা বানাতে হয়। সোজাসুজি পথ SMP তে আলো সবচেয়ে কম সময় নেয় ফলে ঐ পথ বরাবর আলোকে মোটা পুরুত্বের কাঁচ দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। SAP পথ দীর্ঘ হওয়ায় প্রান্তবিন্দু A তে কাঁচের পুরুত্ব সবচেয়ে কম থাকে। ফলে লেন্সের মধ্যদিয়ে আলোকে যে কোন পথে যেতে একই সময় নেয়। ফলে প্রতিটি পথের জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক একই হওয়ায় একটি বড়সড় লম্বি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যায়।

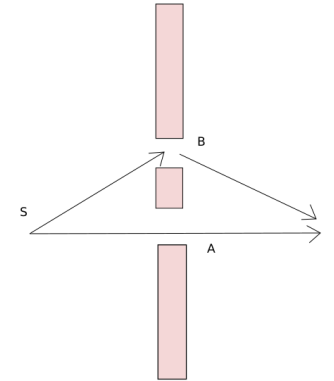
যেহেতু SAP পথ দীর্ঘ তাই এখানে কাঁচের পুরুত্ব সবচেয়ে কম। SMP পথ সোজাসুজি হওয়ায় কাঁচের পুরুত্ব বেশি। ফলে সময়ের সাথে অতিক্রান্ত পথের লেখচিত্র একটি সরলরেখা হয়। কারণ প্রতিটি পথে অতিক্রান্ত সময় একই। অতিক্রান্ত পথের সময় একই হওয়ায় প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিক একই থাকে। ফলে লম্বি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের একটি বড়সড় মান দেখায়। এটাই হচ্ছে লেন্স। আসলে লেন্স আলোকে এমন একটা বিন্দুতে মিলিত করে, যে বিন্দুতে আলো আসতে একই সময় নেয় এবং এই কাজটা করা হয় কাঁচের পুরুত্ব বাড়িয়ে কমিয়ে।

যেই অংশে আলোর অতিক্রান্ত সময় কম সেই অংশে কাঁচের পুরুত্ব বেশি এবং যেই অংশে আলোর অতিক্রান্ত সময় বেশী সেই অংশে কাঁচের পুরুত্ব কম রাখা হয়। ফলে তৈরী হয় লেন্স।

ব্যতিচার

আমরা যখন আংশিক প্রতিফলন নিয়ে পরীক্ষা করছিলাম তখন আমরা দেখলাম আলো কাঁচ ফলকের উপর আপতিত হলে আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না আলো কি প্রতিফলিত হবে নাকি কাঁচ মাধ্যম ভেদ করে চলে যাবে?

আমরা কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসের সম্ভাবনা দিয়ে হিসাব করলাম যে সর্বোচ্চ 16% পর্যন্ত আলো প্রতিফলিত হতে পারে। আমরা যে কোন আলোকীয় ঘটনা ব্যাখ্যা করি একটি সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে—ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা কত? আমরা কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না ঘটনাটি কখন ঘটবে। আমরা কি আদৌ নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। এই ব্যাপারটা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করব।

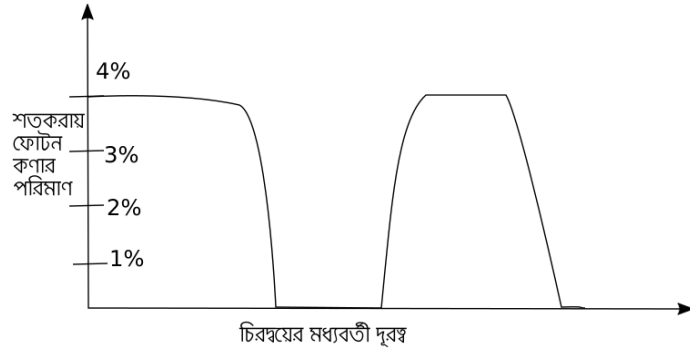


চিত্র ৪৪: একটি কাঁচ ফলকের দুইটি চির A ও B, একটি আলোক উৎস S এবং একটি ডিটেক্টর D দেখানো হয়েছে।

চিত্র-৪৪ এ এমন একটি ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে যেখানে একটি কাঁচ ফলকের দুইটি চির A, B একটি আলোক উৎস S এবং একটি ডিটেক্টর D চিত্রিত করা হয়েছে। উৎস S থেকে আলো A ও B যে কোন পথে ডিটেক্টর D তে

পৌছায়। প্রথমে B তে অবস্থিত চিরটি বন্ধ দেই। ফলে উৎস S থেকে আলো চির A দিয়ে প্রবেশ করে ডিটেক্টর D তে পৌছাবে। ফলে যতগুলো ফোটন কণা ডিটেক্টর D তে পৌছাবে ততবার ডিটেক্টরটি শব্দ তৈরি করবে। ধরি উৎস S থেকে 100 টি ফোটন কণা নির্গত হলে 1টি ফোটন কণা চির A হয়ে ডিটেক্টর D তে পৌছবে। অর্থাৎ B চির বন্ধ করলে। 1% ফোটন কণা চির A হয়ে ডিটেক্টর D তে পৌছায়। ঠিক এইভাবে চির A বন্ধ করলে। 1% ফোটন কণা চির B হয়ে ডিটেক্টর D তে পৌছায়।

এইবার যদি দুইটি চির A ও B একসাথে খুলে দেয়া হয় তাহলে কত পার্সেন্ট ফোটন কণা ডিটেক্টর D তে আসা উচিত? স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু প্রতিটি চির দিয়ে। 1% করে ফোটন কণা প্রবেশ করে তাই। $1\% + 1\% = 2\%$ ফোটন কণা ডিটেক্টর D এর ডিটেক্ট করা উচিত কিন্তু আসলে তা হয় না সর্বনিম্ন 0% এবং সর্বোচ্চ 4% ফোটন কণা ডিটেক্ট করতে পারে। এইবার চির দুইটি এখন যে দূরত্বে আছে, এই দূরত্ব যদি আরো কমানো হয় তাহলে দেখা যাবে কোন আলোই ডিটেক্টর D তে এসে পৌছাচ্ছেনা— কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি যদি আলোর গতিপথ সরু করে দেয়া হয় তাহলে আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে চিরদ্বয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে আলো প্রবেশ করানো হয় এবং চিরদ্বয়ের মধ্য দিয়ে তখন 0%–4% পর্যন্ত ফোটন কণা প্রবেশ করতে পারে। এটিই ব্যতিচার।



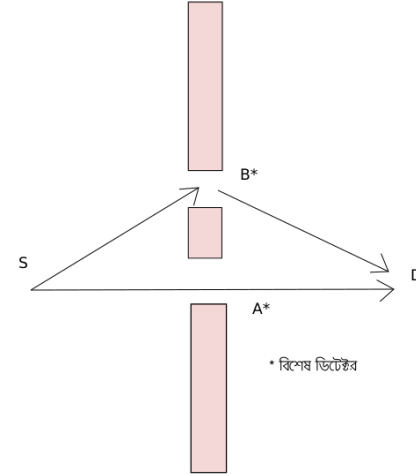
চিত্র ৪৫: চিরদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করে সর্বনিম্ন 0% থেকে সর্বোচ্চ 4% আলো ডিটেক্টর D তে পৌছাতে পারে। যখন দুইটি চিরই খুলে দেওয়া হয় তখন উপরের চিত্রের মত আলো ডিটেক্টরে পৌছায়।

দেখ আমরা আসলে একটা যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম। চির A ও B দুইটিই খুলে দিলে 1% করে মোট 2% আলো ডিটেক্টর D তে আসার কথা কিন্তু আমরা

দেখলাম চির দুইটি খুলে দিলে চিরদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করে সর্বনিম্ন 0% থেকে সর্বোচ্চ 16% পর্যন্ত আলো পৌছায়।

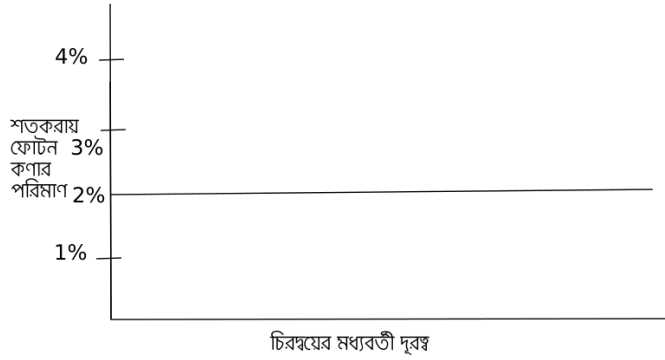
এইবার আমরা একটু দেখতে চাই আলো কোন চির দিয়ে প্রবেশ করে এবং কোন চির দিয়ে কতটুকু আলো ডিটেক্টর D তে আসে।

এইজন্য চির A ও B তে যথাক্রমে দুইটি বিশেষ ডিটেক্টর A* ও B* বসানো হলো।



চিত্র ৪৬: আলো কোন চির দিয়ে প্রবেশ করে সেটা নির্ণয় করার জন্য চির A ও B তে দুইটি বিশেষ ডিটেক্টর A* ও B* বসানো হল।

এইবার পূর্বের মতই ডিটেক্টর A* ও D বন্ধ করা হলে দেখা যাবে 1% ফোটন কণা ডিটেক্টর B* ডিটেক্ট করতে পারছে। আবার যদি B* ও D বন্ধ করা হয় দেখা যাবে 1% ফোটন কণা ডিটেক্টর A* ডিটেক্ট করতে পারছে। এইবার যদি ডিটেক্টর D বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে 2% ফোটন কণা চির A ও B দিয়ে প্রবেশ করছে। তুমি মোটেও এইবার চিত্র-৪৫ এর মত গ্রাফ পাবে না।



চিত্র ৪৭: চিরদূরে দুইটি বিশেষ ডিটেক্টর A* ও B* বসালে দেখা যাবে যে সর্বদা 2% আলো চির দিয়ে প্রবেশ করছে। যাই করা হোক না কেন এইবার সর্বদা 2% আলোই পাওয়া যাবে। কেউ কি বলতে পারেন কেন এটা হল?

কি অদ্ভুত! যখন আমরা দেখতে চাইলাম কোন চির দিয়ে কতটুকু আলো প্রবেশ করে তখন দেখলাম সর্বদা 2% আলো চিরদূর দিয়ে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ব্যতিচার পাওয়া যায় না।

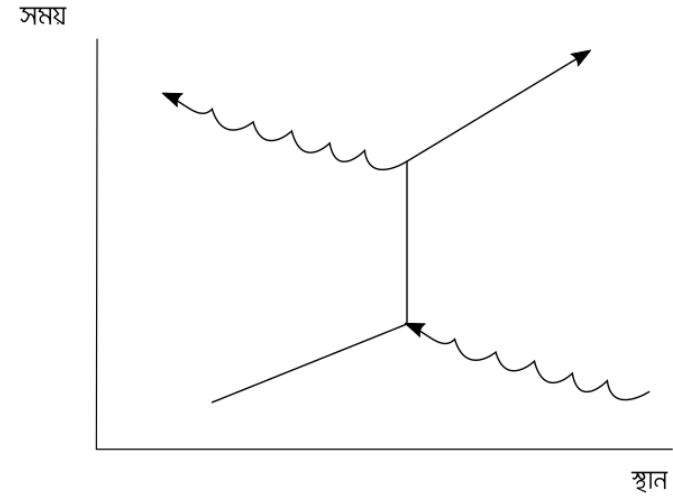
যখন আমরা চিত্র-৪৪ এর মত পরীক্ষা ব্যবস্থায় কোন ডিটেক্টর বসাই নি, তখন দেখলাম 0%-4% পর্যন্ত ফোটন কণা চিরদূর দিয়ে প্রবেশ করে। (চিত্র-৪৫) ফলে ব্যতিচার সৃষ্টি হয়।

আসলে প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে। প্রকৃতি আমাদের জানাতে চায় না সে কিভাবে কাজ করে। যখনই আমরা এই রহস্যভেদ করার চেষ্টা করি তখন সে আর স্বাভাবিক থাকে না। ঠিক একইভাবে আলো আমাদের বলতে চায় না সে কোন পথে যায়। যখনই আমরা জানার চেষ্টা করি সে কিভাবে কোন পথে যেয়ে ব্যতিচার সৃষ্টি করে তখনই সে আর ব্যতিচার দেখায় না।

একটি আলোকীয় ঘটনা কখনোই একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা রেখে ঘটে না, ঘটনাটি সম্ভাব্য সবগুলো ফলাফলের সম্ভাবনা নিয়ে ঘটে। এইবার আমরা চির A ও B তে ডিটেক্টর রাখব কিন্তু ব্যতিচার সৃষ্টি করব। তাই চির A ও B তে এমন ডিটেক্টর ব্যবহার করব যা পারফেক্ট না অর্থাৎ ডিটেক্টরটি মাঝে মাঝে ফোটন কণা ডিটেক্ট করতে পারে মাঝে মাঝে পারে না। এইক্ষেত্রে 3 টা ঘটনা ঘটতে পারে।

- ১) ডিটেক্টর A ও D দুটোই বন্ধ
- ২) ডিটেক্টর B ও D দুটোই বন্ধ
- ৩) ডিটেক্টর D দুটোই বন্ধ

(১) ও (২) এর জন্য ব্যাখ্যা চিত্র-৪৬ এর মতই। অর্থাৎ A ও D বন্ধ হলে দেখা যাবে 1% ফোটন কণা ডিটেক্টর B দিয়ে প্রবেশ করছে। আবার B ও D বন্ধ করা হলে দেখব 1% ফোটন কণা ডিটেক্টর A ডিটেক্ট করছে। কিন্তু যখন ডিটেক্টর D বন্ধ করা হচ্ছে তখন দেখা যাবে ফোটন কণা A ও B চিরদূর দিয়ে প্রবেশের সময় একটা সম্ভাবনা রেখে প্রবেশ করবে। কারণ ডিটেক্টর A ও B পারফেক্ট না হওয়ায় আমরা জানি না কখন ফোটন কণা ডিটেক্ট হবে কখন হবে না। ফলে ব্যতিচার সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমরা এইবার 4% এর চেয়ে কম ফোটন কণা ডিটেক্ট করব।



চিত্র ৪৮: চিরদূরে অবস্থিত ডিটেক্টর A ও B পারফেক্ট না হওয়ায় এইক্ষেত্রে ব্যতিচার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। কারণ আলো একটা সম্ভাবনা রেখে প্রবেশ করে।

ঠিক এইভাবে আরো ইমপারফেক্ট ডিটেক্টর ব্যবহার করা হলে দেখা যাবে চিত্র-৪৫ এর মত 0%-4% পর্যন্ত ব্যতিচার সৃষ্টি করা সম্ভব।

ইলেকট্রন কি আলোর বেগে চলতে পারে?

আলোকে চির দিয়ে দুই ভাগ করার ঘটনা দিয়ে আরো সহজ ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ব্যাখ্যা করা সম্ভব ফোটন ও ইলেকট্রন পরস্পরের সাথে কিভাবে ক্রিয়া করে। আসলেই কি কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। 3 টি শর্ত দিয়েই ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শত 3 টি ব্যাখ্যা করার আগে আমরা একটু ইলেকট্রন সম্পর্কে জেনে নেই।

১৮৯৫ সালে প্রথম ইলেকট্রন আবিষ্কার হয়। তৈল-বিন্দু নামক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম ইলেকট্রনের চার্জ নির্ণয় করা হয়। পরবর্তীতে রাদারফোর্ড এবং নীলস বোর পরমাণুর মডেল ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেন পরমাণুর দুইটি অংশ কেন্দ্রে ভারী অংশটির নাম নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াস কে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন। ১৯২৪-এ লুইস ডি-ব্রগলি বললেন যে, ইলেকট্রন তরঙ্গের মত আচরণ করে। পরবর্তীতে সি.জে. ডেভিসন এবং এল.এইচ. গামার বেল ল্যাবে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেন ইলেকট্রনের মধ্যে তরঙ্গ ধর্ম বিদ্যমান।

আমরা দেখেছি ফোটন কণা সোজা পথে চলে যখন আলোর চলার পথ প্রশস্ত রাখা হয়। কিন্তু যখনই এই পথ সংকীর্ণ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয় তখনই আলো ছড়িয়ে পড়ে। (চিত্র-৪০ এবং ৪১)। ঠিক একইরূপ আচরণ করে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনকে উন্মুক্ত পথে ছেড়ে দিলে সে কণার মত আচরণ করে। কিন্তু চলার পথ সংকীর্ণ করে দিলে সে তরঙ্গের মত আচরণ করে। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক।

বাসা বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগে সুইচ চালানোর সাথে সাথে ফ্যান-বাতি জ্বলে উঠে। যেহেতু বৈদ্যুতিক প্রবাহ হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রবাহ ফলে ইলেকট্রন এখানে কণাধর্মী আচরণ করলে একটা করে ইলেকট্রন সুইচ থেকে বাতিতে পৌছাতে কিছুক্ষণ সময় নিত। এখানে কিন্তু বাতি জ্বলতে মোটেও সময় নেয় না। কারণ যেই বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহ হয় সেখানে ইলেকট্রনের চলার পথ সংকীর্ণ হওয়ায় ইলেকট্রন তখন তরঙ্গের মত আচরণ করে এবং ইলেকট্রন প্রায় আলোর বেগে চলে। ফলে সাথে সাথে বাতি জ্বলে ওঠে।

ফোটন এবং ইলেকট্রনের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক

আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম আলো তথা ফোটন কণা ও ইলেকট্রন তরঙ্গ এবং কণাধর্মী উভয় আচরণই প্রকাশ করে। ফলে ফোটন কণাকে যেভাবে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে ইলেকট্রনকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শুধু তাই নয় কোয়ার্ক, গ্লুয়ন নিউট্রিনো অন্যান্য কণাগুলোও কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই ব্যাখ্যা করার জন্য 3 টি শর্ত মাথায় রাখা প্রয়োজন এবং 3 টি শর্ত দিয়েই আলো এবং ইলেকট্রনের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

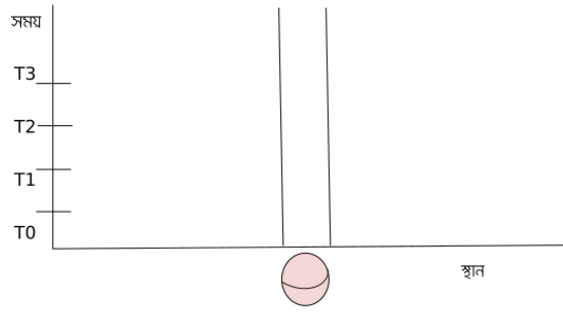
শর্ত ১ : ফোটনের স্থানান্তর সম্ভব

শর্ত ২ : ইলেকট্রনের স্থানান্তর সম্ভব

শর্ত ৩ : ইলেকট্রনের স্থানান্তরকালে ইলেকট্রন ফোটন নির্গমণ অথবা শোষণ করবে।

প্রতিটি শর্তের জন্য থাকবে একটি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড আমরা এই শর্ত 3 টি দিয়ে ব্যাখ্যা করব স্থান-কাল দিয়ে। শর্ত 3 টি ব্যাখ্যা করার আগে আমাদের একটু স্থান-কাল নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা আপেক্ষিকতার জটিল কোন তত্ত্ব দিয়ে স্থান-কাল আলোচনা করব না। আমরা এইখানে বুঝার চেষ্টা করব স্থান-কাল দিয়ে কিভাবে একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এই আলোচনার জন্য x-অক্ষের বরাবর থাকবে স্থান এবং y অক্ষ বরাবর সময়। ধর একটি ফুটবল হাতে তুমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছ। এই ঘটনাটি স্থান-কাল লেখচিত্রে তুমি কীভাবে প্রকাশ করবে?

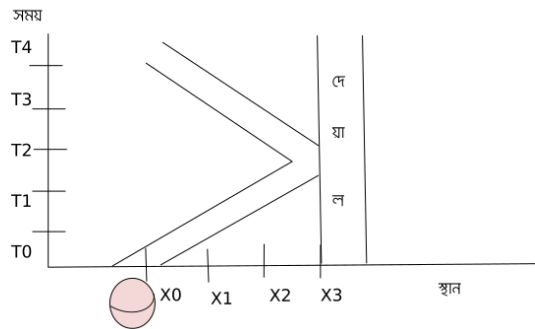


চিত্র- ৪৯: পাশের চিত্রে ফুটবল হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে স্থান কাল লেখাচিত্রে ঘটনাটি কিভাবে প্রকাশ হবে তা দেখানো হয়েছে। ফুটবলের অবস্থান পরিবর্তন হবে না কিন্তু সময় বাড়তেই থাকবে। ফুটবল তার ব্যাস-সমপরিমাণ স্থান দখল করে থাকবে এবং সময় উপরের দিকে উঠতেই থাকবে।

যেহেতু সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু ফুটবলের অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে না। তাই ফুটবল সেখানে T_0 সময়ে ছিল, T_1 সময় পর সেখানেই থাকবে, T_2 , T_3 সময়েও ফুটবলের স্থান পরিবর্তন হবে না। ফুটবলটি সর্বদা তার ব্যাস পরিমাণ স্থান দখল করে থাকবে।

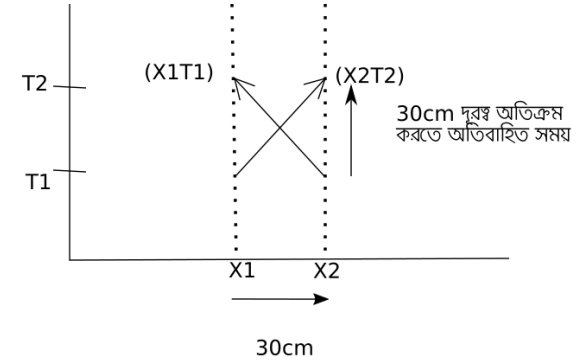
আমরা আরো একটি ঘটনা স্থান-কাল লেখাচিত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

এইবার তুমি ফুটবলটিকে মাঠের পাশের একটি দেয়ালে ছুঁড়ে মারলে, ফুটবলটি দেয়ালে আঘাত করে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসল। ঘটনাটি তুমি কিভাবে প্রকাশ করবে?



চিত্র: ৫০: ফুটবলটি দেয়ালে আঘাত করার পর হাতে ফিরে আসলে লেখাচিত্রটি হয় পাশের চিত্রের মত। ফুটবলটি দেয়াল আঘাত করার পূর্বে X_0-X_3 অবস্থান পরিবর্তন করে এবং দেয়ালে আঘাত করতে সময় নেয় T_0-T_4 অবস্থান পরিবর্তন করে এবং T_4-T_8 সময় নেয় হাতে ফিরে আসতে।

চিত্র-৫০ এ দেখা যাচ্ছে ফুটবলটি দেয়ালে আঘাত করতে T_0-T_4 সময় নিচ্ছে এবং দেয়ালে আঘাত করার পর হাতে আসতে T_4-T_8 সময় লাগছে। আমরা একইভাবে ফোটন এবং ইলেকট্রনকে স্থান-কালে ব্যাখ্যা করব। আলোর বেগে চলমান কণা নির্দেশ করার জন্য আমরা 45° কোণে সরলরেখা আঁকব।



চিত্র ৫১: একটি কণা আলোর বেগে $X_1 T_1$ থেকে $30cm$ দূরত্বে অবস্থিত X_2 বিন্দুতে T_2 সময়ে পৌঁছায়। ফলে কণাটির নতুন স্থান-কাল বিন্দু হয় $X_2 T_2$ ।

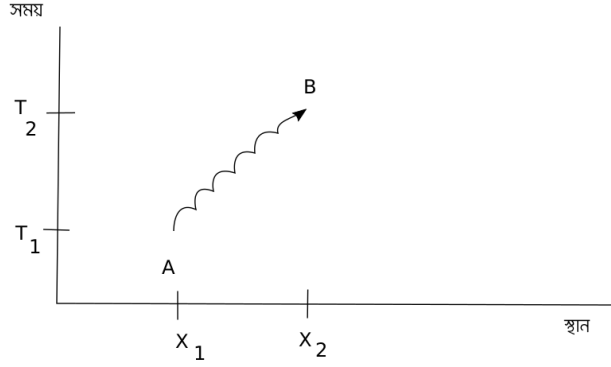
ধরা যাক- একটি কণা আলোর বেগে স্থানকালের $X_1 T_1$ অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে $X_2 T_2$ তে পৌঁছায়। X_1 ও T_2 এর দূরত্ব $30 cm$ । তাহলে এর প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড কত হবে? প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান নির্ভর করবে স্থান ব্যবধান $X_2 - T_2$ এবং সময় ব্যবধান $T_2 - T_1$ এর উপর। গাণিতিকভাবে এই ঘটনাকে প্রকাশ করা যায়।

$$P(X_1 T_1 - X_2 T_2) = (X_2 - X_1)^2 - (T_2 - T_1)^2$$

ভয় পেয়ো না আর কোন গাণিতিক সমীকরণের কপকচানি চলবে না। সাহস করে যখন এতটুকু পড়েই ফেলেছ তাহলে উপরের সমীকরণটি একটু বুঝার চেষ্টা করি- P দিয়ে প্রবাবিলিটি অর্থাৎ সম্ভাবনা বুঝানো হয়েছে। কণাটির X_1 অবস্থান থেকে T_1 সময় যাত্রা শুরু করে $30 cm$ দূরবর্তী বিন্দু X_2 তে T_2 সময়ে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে $P(X_1 T_1 - X_2 T_2)$ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঠিক একইভাবে যদি একটি ফোটন কণা অবস্থান A থেকে B তে পৌঁছায় তাহলে তার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড কিভাবে প্রকাশ করব? আগের মতই

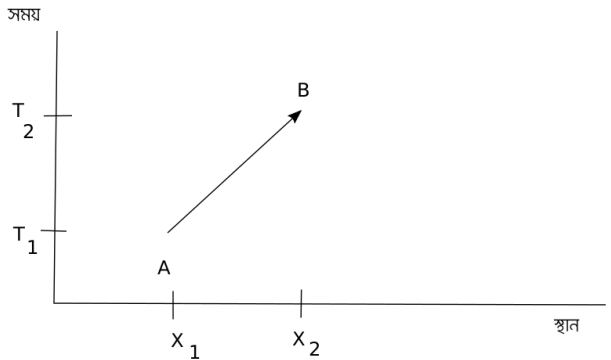
ফোটন কণার A অবস্থান থেকে B অবস্থান পরিবর্তনের জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $P(A - B)$ । চল আমরা অবস্থান পরিবর্তন করা ফোটন কণাটিকে স্থানকাল লেখচিত্রে প্রকাশ করি।



চিত্র ৫২: ফোটন কণার অবস্থান A থেকে অবস্থান B তে পরিবর্তন প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড $P(A - B)$ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

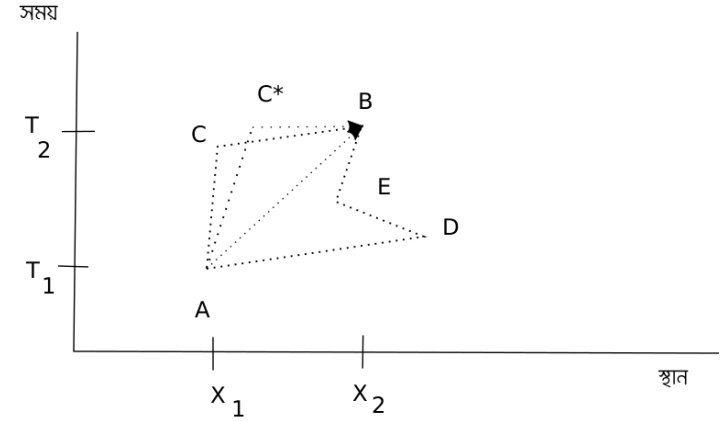
দেখ আমরা শর্ত-1 ব্যাখ্যা করে ফেলেছি এবং ফোটনের এই অবস্থানকে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে কিভাবে প্রকাশ করা সম্ভব সেটাও দেখেছি।

শর্ত-2 হচ্ছে ইলেকট্রনেরও ফোটনের মত স্থানান্তর সম্ভব। যেমন স্থান-কাল লেখচিত্রে ইলেকট্রন A অবস্থান থেকে B অবস্থানে গেলে তার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $E(A - B)$ ।



চিত্র ৫৩: ইলেকট্রনের অবস্থান পরিবর্তনকেও প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে প্রকাশ করা যায়। উপরের চিত্রে ইলেকট্রনের A থেকে B তে অবস্থান পরিবর্তনের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $E(A - B)$ ।

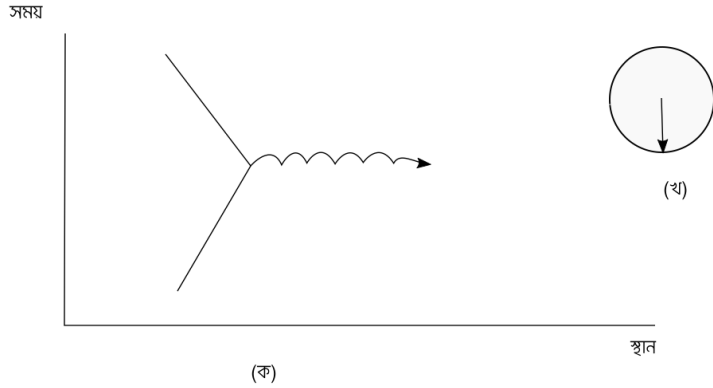
ইলেকট্রন A অবস্থান থেকে B অবস্থানে যে, চিত্র 53 এর মত এরকম সোজাসুজি পৌঁছে যাবে সে রকম না। ফোটন কণার মত যতগুলো পথ সম্ভব সবগুলো পথ এই অবস্থান পরিবর্তন করার সময় হিসাবে আনতে হবে।



চিত্র ৫৪ : ইলেকট্রনের অবস্থান পরিবর্তন সম্ভাব্য যে কোন পথে হতে পারে। ইলেকট্রন A থেকে B তে সম্ভাব্য যে পথে পৌঁছাতে পারে তা চিত্রে দেখানো হল।

চিত্র ৫৪ তে দেখানো হয়েছে ইলেকট্রন A অবস্থান থেকে B অবস্থানে দুই ধাপে AC অথবা AC' হয়ে B তে পৌঁছাতে পারে। ইলেকট্রনটি যেভাবেই পৌঁছাক না কেন A অবস্থান থেকে B অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য ইলেকট্রনের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান হবে $E(A - B)$ ।

শর্ত ৩ হচ্ছে একটি ইলেকট্রন ফোটন শোষণ অথবা নির্গমন উভয়ই করতে পারে। ইলেকট্রনের ফোটন কণা শোষণ এবং নির্গমনের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড প্রকাশ করা হয় j দিয়ে এবং এই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান 0.1। এই প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের স্টপ ওয়াচের কাটা ৬ বরাবর পৌঁছায় যেন মনে হয় ৬টা বেজে আছে।

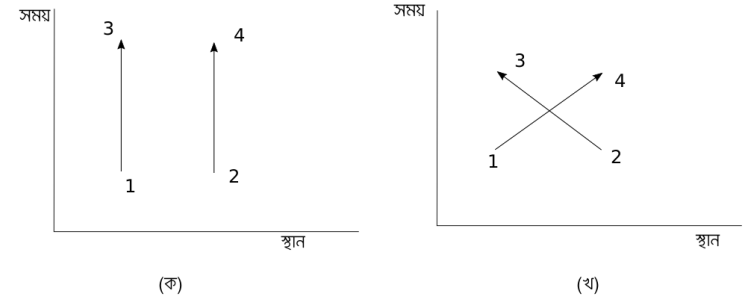


চিত্র ৫৫: ইলেকট্রন ফোটন নির্গমন ও শোষণ করে 0.1 সম্ভাবনা নিয়ে। এই ঘটনার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড ঘড়ির কাটার ৬ বরাবর। একে প্রকাশ করা হয় j দিয়ে।

চিত্র ৫৫ এ নির্গত ফোটনকে টেউ খেলানো রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম

এইবার আমরা দেখব দুইটি ইলেকট্রন যখন একই সাথে স্থান কালের পরিবর্তন ঘটাতে তখন তার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড কেমন হবে?



চিত্র-৫৬: দুইটি ইলেকট্রনের সম্ভাব্য দুইটি পথে (ক এবং খ) স্থানান্তর দেখানো হল। চিত্র-ক এ ইলেকট্রন দুইটি 1 এবং 2 নং অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে যথাক্রমে 3 ও 4 নং অবস্থানে পৌঁছায়। চিত্র-খ এ ইলেকট্রন দুইটির আরেকটি সম্ভাব্য পথ দেখানো হয়েছে যেখানে 1 থেকে একটি ইলেকট্রন 4 এ স্থানান্তরিত হয়। অপর ইলেকট্রনটির 2 থেকে 3 এ স্থানান্তর হয়।

চিত্র 56 এ দুইটি ইলেকট্রনের স্থানান্তর দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫৬ (ক) এ 1 থেকে 3 এ ইলেকট্রনটির স্থানান্তরের জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে $E(1-3)$ এবং 2 থেকে 4 এ স্থানান্তরের জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে $E(2-4)$ ।

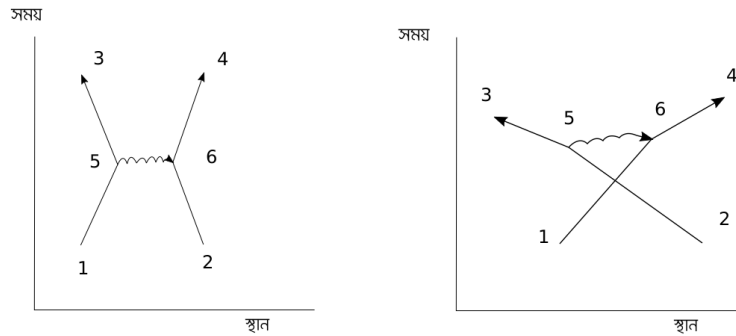
দেখ আমরা আলাদা আলাদাভাবে দুইটি ইলেকট্রনের জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হিসাব করলাম। দুইটি ইলেকট্রন কিন্তু একসাথে অবস্থান পরিবর্তন করে। যখন দুইটি ঘটনা একসাথে ঘটে তখন প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে প্রতিটি আলাদা ঘটনার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের গুণফলের সমান। ফলে চিত্র 56 (ক) এর জন্য প্রবাবিলিপি অ্যামপ্লিটিউড হবে $E(1-3) * E(2-4)$ ।

চিত্র ৫৬ (খ) এর জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডকে কিভাবে প্রকাশ করবে? তোমার উত্তর যদি হয় $E(1-3) * E(2-4)$ তাহলে তুমি পুরো ব্যাপারটা বুঝেছ।

দেখ চিত্র ৫৬ (ক) ও ৫৬ (খ) তে ইলেকট্রনের স্থানান্তরের জন্য দুইটি সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। ৫৬ (ক) ও ৫৬ (খ) একসাথে ঘটার সম্ভাবনার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে।

$$E(1-3) * E(2-4) + E(1-4) * E(2-3)$$

চিত্র ৫৬ (ক) ও (খ) তে ইলেকট্রন অবস্থান পরিবর্তনকালে কোন ফোটন কণা শোষণ অথবা নির্গমন করে নাই। আমরা চাচ্ছি একটি ইলেকট্রন ফোটন কণা নির্গমন করবে এবং অপর ইলেকট্রনটি সেই নির্গত ফোটন কণা শোষণ করবে।



চিত্র ৫৭: এখানে ফোটন কণার আদান-প্রদান দেখানো হলো। উভয় ক্ষেত্রেই একটি ইলেকট্রন ফোটন কণা নির্গমন করে এবং অপর ইলেকট্রন সেটি শোষণ করে। ফোটন কণা নির্গমন ও শোষণের সম্ভাবনার মান ০১। এর প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড কে j দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

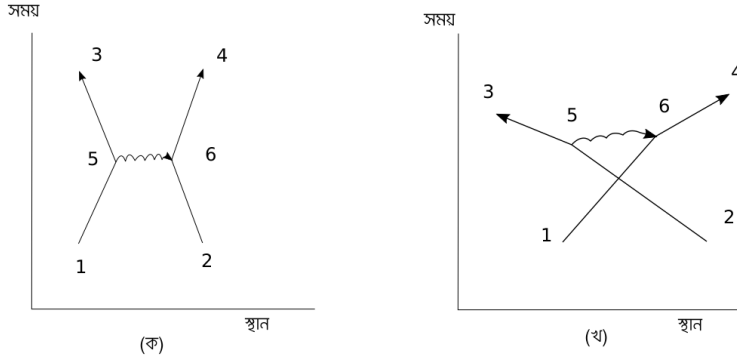
দেখ চিত্র ৫৭ (ক) এবং (খ) উভয়ক্ষেত্রেই নতুন দুইটি ঘটনা ঘটে। প্রথমত ইলেকট্রনদ্বয় ফোটন কণা আদান-প্রদান করে দ্বিতীয়ত নির্গত ফোটনের ৫ থেকে ৬ এ স্থানান্তর হয়। তাহলে চিত্র ৫৭ (ক) এর জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে- $E(1-5) \times j \times E(5-3) \times E(2-6) \times j \times E(6-4) \times P(5-6)$ । প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের দিকে তাকালে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন মাথায় আসা উচিত। দুইবার কেন j দিয়ে গুণ করা হল? দেখ ঘটনা কিন্তু দুইটি ঘটেছে অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন ফোটন নির্গমন করেছে এবং অপর ইলেকট্রন সেই ফোটন শোষণ করেছে। ফলে ৫নং অবস্থানে এসে ইলেকট্রনটির ফোটন নির্গমনের জন্য একবার j দিয়ে গুণ করা হয়েছে এবং

অপর ইলেকট্রনটি সেই ফোটন কণা ৬ নং অবস্থানে শোষণ করে- সে জন্য আরেকবার j দিয়ে গুণ করা হয়েছে।

চিত্র ৫৭ (খ) এর জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $E(1-6) \times j \times E(6-4) \times E(2-5) \times E(5-3) \times P(5-6)$ । তোমরা কি কেউ বলতে পারবে চিত্র ৫৭ (ক) এবং ৫৭ (খ) দুইটি ঘটনার একসাথে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড কিভাবে প্রকাশ করবে? একটু চিন্তা কর। উত্তর খুঁজে না পেলো চিত্র-৫৬ (ক) ও (খ) এর ব্যাখ্যাকৃত অংশটুকু আবার মনোযোগ দিয়ে পড়। চিত্র ৫৭ (ক) এবং (খ) ই হচ্ছে ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম। যা বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান এর নামে রাখা হচ্ছে। এই ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের কারণেই পদার্থের সাথে ফোটন কণার সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে নতুন নতুন পার্টিকেল খুঁজে বের করার রহস্য। ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে নিউট্রন ক্ষয় হয়ে কিভাবে প্রোটন, ইলেকট্রন ও একটি ইলেকট্রন নিউট্রিনো তৈরি করে। ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় একটি ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রনের সংঘর্ষে কিভাবে শক্তি ও ফোটন কণা তৈরি হয়।

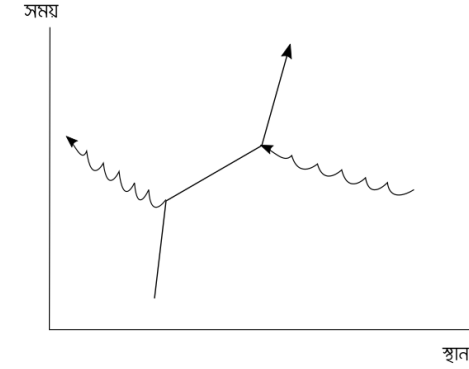
ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন

আমরা আলোর বিক্ষেপণ দেখি। বিক্ষেপণের কারণেই আকাশ নীল দেখায়। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় আকাশে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে এই বিক্ষেপণ। ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম দিয়ে আলোর বিক্ষেপণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিক্ষেপণের সময় ইলেকট্রন প্রথমে ফোটন কণা শোষণ করে, তারপর ইলেকট্রনটি কিছুদূর এগিয়ে শোষিত ফোটনটি নির্গমন করে।



চিত্র ৫৮: বিক্ষেপণকালে ইলেকট্রন ফোটন শোষণ করার পর কিছুদূর এগিয়ে যায়, তারপর ইলেকট্রনটি শোষিত ফোটন নির্গমন করে বিপরীত দিকে চলে যায়।

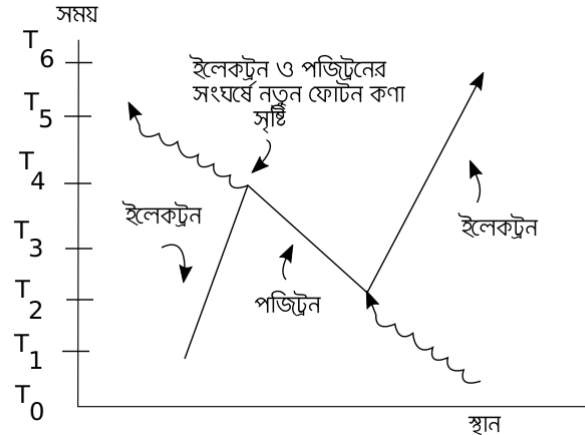
আবার এমনও হতে পারে ইলেকট্রনটি ফোটন নির্গত করল তারপর কিছুদূর সামনে যেয়ে ফোটন শোষণ করল। তখন ফাইনম্যান ডায়াগ্রামটি হবে এমন।



চিত্র ৫৯: বিক্ষেপণকালে ইলেকট্রন ফোটন নির্গত করে তারপর শোষণ করতে পারে এমনও হতে পারে।

চিত্র ৫৮ এবং ৫৯ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইলেকট্রন ফোটন কণা নির্গমন বা শোষণ করার কিছু সময় পর ফোটন শোষণ বা নির্গত করে। এইখানে একটা মজার ব্যাপার বলে রাখি ইলেকট্রনের চার্জ সৃষ্টির বহস্য এই ফোটন-কণার আদান-প্রদান। এই চার্জ ঋণাত্মক।

ইলেকট্রনের এক ধরনের প্রতিকণা আছে যার চার্জ ধনাত্মক। এর নাম পজিট্রন। পজিট্রন চিত্র ৫৮-৫৯ এর মত কাজ করে না। পজিট্রন ফোটন নির্গত করার পর সময়ের বিপরীত দিকে যেয়ে ফোটন শোষণ করে।



চিত্র ৬০: পজিট্রন T_5 সময়ে ফোটন কণা নির্গত করার পর সময়ের বিপরীতে যেয়ে T_3 সময়ে ফোটন শোষণ করে।

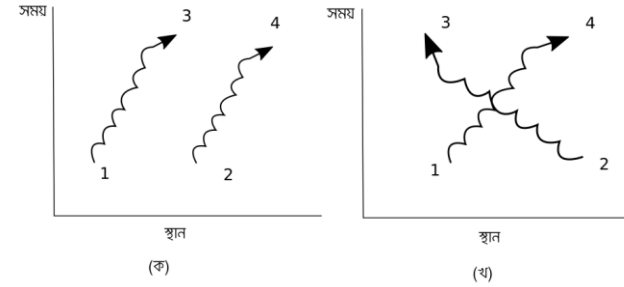
চিত্র ৬০ এ দেখ পজিট্রন সময়ের বিপরীতে যেয়ে ফোটন শোষণ করছে। প্রতিকণাগুলো আসলে সময়ের বিপরীতেই যায়। যারা একটুকু পড়ে খুব খুশি হয়ে গেছে এইতো টাইম ট্রাভেলিং! আসলে তা নয়!

আমরা সময়কে T_0 – T_6 পর্যন্ত ভাগ করে নিলাম। T_0 – T_3 পর্যন্ত ইলেকট্রন ও ফোটন উভয়ই সম্মুখ দিকে অগ্রসর হল। T_3 তে ফোটন দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং দুইটি পার্টিকলে পরিনত হল। যার একটি নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রন এবং অপরটি পজিটিভ চার্জযুক্ত পজিট্রন।

পজিটিভ চার্জযুক্ত পজিট্রন T_5 সময়ে ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ফলে নতুন ফোটন কণা সৃষ্টি হয়। এভাবেই কণা ও প্রতিকণার সংঘর্ষে শক্তি ও ফোটন সৃষ্টি হয়।

১৯৩১ সালে পল ডিরাক প্রতিকণার ভবিষ্যৎবাণী করেন। ১৯৫২ সালে গার্ল অ্যান্ডারসন ন্যাবরেটরীতে প্রতিকণা পজিট্রনের সন্ধান পান। আমরা ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম দিয়েই (চিত্র-৬০) ব্যাখ্যা করলাম কিভাবে ফোটন থেকে ইলেকট্রন পজিট্রন তৈরি হয়। পরীক্ষাগারে পজিট্রন তৈরি করার সময় ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে দুইটি ফোটন কণাকে সংঘর্ষে লিপ্ত করা হয়।

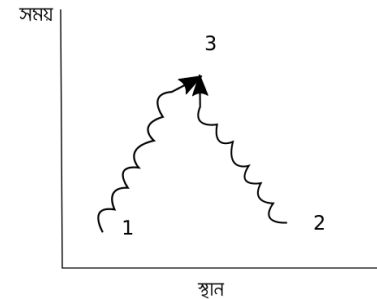
লেজার এবং পলির বর্জন নীতি



চিত্র ৬১: (ক) ও (খ) এ ফোটনের স্থানান্তর দেখানো হয়েছে। ১ ও ২ নং পজিশনে ফোটন দুইটি কিছু সময় পর ৩ ও ৪ নং পজিশনে আসে (ক)। (খ) এ ১ ও ২ নং পজিশন থেকে ফোটন দুইটি যথাক্রমে ৪ ও ৩ নং পজিশনে স্থানান্তরিত হয়।

চিত্র ৬১ (ক) এর জন্য ফোটন কণার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $P(1-3) * P(2-4)$ । চিত্র (খ) এর জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $P(2-3) * P(1-4)$ ।

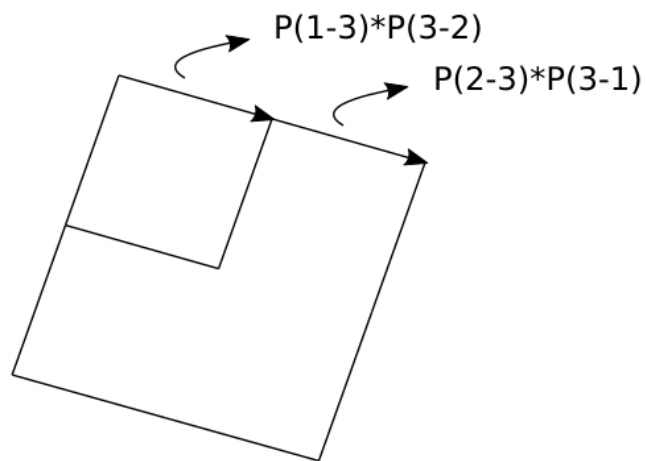
ফোটন কণা দুইটি যখন একটি বিন্দুতে আপতিত হবে তখন প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড কত হবে?



চিত্র ৬২: ফোটন কণা দুইটি একটি বিন্দুতে আপতিত হলে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড যোগ হয়। ফলে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান বেড়ে যায়।

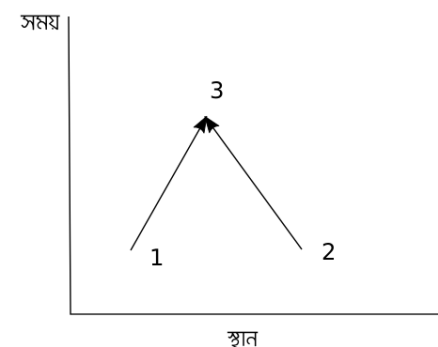
চিত্র ৬২ ব্যাখ্যা করা যায় এই ভাবে ১ নং অবস্থানের ফোটনটি ৩ হয়ে ২ নং পজিশনে আসে। ফলে ১ নং পজিশনে অবস্থিত ফোটনটির জন্য প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $P(1-3) * P(3-2)$ ।

ঠিক একইভাবে ২ নং পজিশনের ফোটনটি ৩ হয়ে ১ নং অবস্থানে আসে। ফলে ২ নং পজিশনের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $P(2-3) * P(3-1)$ । দেখ দুইটি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান একই এবং স্টপওয়াচের সাহায্যে এদের দিক নির্ণয় করতে গেলে দিক একই হবে। ফলে পুরো ঘটনার প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $P(1-3) * P(3-2) + P(2-3) * P(3-1)$ । ফলে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দ্বিগুণ হবে।



চিত্র ৬৩: দুইটি ফোটন একটি বিন্দুতে আপতিত হলে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড দ্বিগুণ। ফলে আলো এক বিন্দুতে আপতিত হওয়ার সম্ভাবনা চারগুণ বেড়ে যায়।

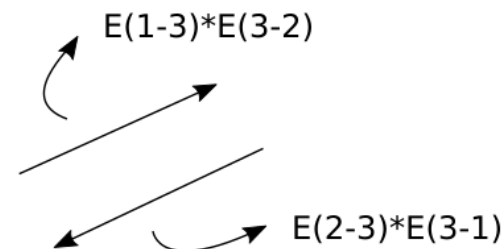
ফলে যত বেশি ফোটন থাকবে ততবেশি ঘটনা ঘটাবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। পরমানুতে যদি আগে থেকেই কিছু ফোটন রাখা যায় তাহলে ফোটন নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। লেজার এ ঠিক এই ঘটনাই ঘটে। এইবার যদি দুইটি ইলেকট্রন এক বিন্দুতে আপতিত করার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে লব্ধি প্রবাবিলিটির অ্যামপ্লিটিউডের মান শূন্য। অর্থাৎ ইলেকট্রন দুইটি কখনোই একবিন্দুতে আপতিত হবে না। এই কারণেই বলা হয় ইলেকট্রন একে অপরকে বিকর্ষণ করে।



চিত্র ৬৪: ইলেকট্রন এক বিন্দুতে আপতিত হতে পারে না।

১ নং বিন্দুতে অবস্থিত ইলেকট্রনটি ১ থেকে ৩ হয়ে তারপর ২ এসে পৌঁছালে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $E(1-3) * E(3-2)$ ২ নং বিন্দুতে অবস্থিত ইলেকট্রনের ২ থেকে ৩ হয়ে তারপর ১ এ যাওয়ার সম্ভাবনা $E(2-3) * E(3-1)$ ।

ফলে পুরো ঘটনার একসাথে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড হবে $E(1-3) * E(3-2) - E(2-3) * E(3-1)$ । এখানে বিয়োগ করার কারণ হচ্ছে ইলেকট্রন পোলারাইজড।



চিত্র ৬৫: ইলেকট্রন একসাথে অবস্থান করতে পারে না কারণ দুইটি ইলেকট্রনের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান একে অপরের বিপরীত দিকে হয়। ফলে লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডের মান শূন্য হয়।

লব্ধি প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড শূন্য হওয়াকে তাত্ত্বিকভাবে বললে এমন হয়। “একইভাবে পোলারাইজড দুইটি ইলেকট্রন কখনোই স্থান কালের একটি বিন্দুতে অবস্থান করতে পারে না।”

এটিই হচ্ছে পলির বর্জন নীতি। এই নীতির কারণে আমরা বলতে পারি 1 টা প্রোটন যখন 1 টা ইলেকট্রনের সাথে ফোটন আদান প্রদান করে তখন সেটা হয় হাইড্রোজেন পরমাণু। দুইটি প্রোটন যখন বিপরীত দিকে পোলারাইজড দুইটি ইলেকট্রনের সাথে ফোটন আদান-প্রদান করে তখন তাকে বলা হয় হিলিয়াম পরমাণু।

এইভাবে তিন, চার, পাঁচটি প্রোটন যখন তিন, চার, পাঁচটি বিপরীত ভাবে পোলারাইজড ইলেকট্রনের সাথে ফোটন আদান প্রদান করে রসায়নবিদেরা তাদের বলেন লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন।

লিথিয়াম পরমাণুতে তিনটি প্রোটন তিনটি ইলেকট্রনের সাথে ফোটন আদান-প্রদান করে। 3 নং ইলেকট্রনটা বাকী দুইটি ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন থেকে একটু দূরে অবস্থান করে এবং 3 নং ইলেকট্রনের সাথে প্রোটনের ফোটন আদান-প্রদান খুবই কম হয়। এই কারণে একটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকতে পারে। এইরকম অসংখ্য লিথিয়াম পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন প্রভাবমুক্ত হয়ে এক পরমাণু থেকে আরেক পরমাণুতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। ফলে সামান্য বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে বিশাল পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। যা হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারীর মূল কৌশল। এই লিথিয়াম ব্যাটারীগুলো আমাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোতে পাওয়ার সোর্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ঠিক একইভাবে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রনের সাথে প্রোটনের ফোটন কণার আদান-প্রদান খুব বেশী হওয়ায় এইসব পরমানুর ইলেকট্রন নিজেদের মধ্যে থাকে। ফলে তারা হয় অন্তরক বা ইনসুলেটর।

পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে সলিড স্টেট ফিজিক্স যেখানে পরমাণুর ধর্ম নিয়ে গবেষণা, পড়াশুনা হয়। এই পরমাণুতে অবস্থিত ইলেকট্রনের ধর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য একটি বিখ্যাত ফাংশন ব্যবহার করা হয়— ফার্মি-ডিরাক প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। এই ফার্মি-ডিরাক ডিস্ট্রিবিউশন শুধুমাত্র ইলেকট্রনের জন্যই প্রযোজ্য। কারণ ইলেকট্রন পলির বর্জন নীতি মেনে চলে। অন্যদিকে বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স আলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। লেজার হচ্ছে বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যবহারিক প্রয়োগ।

কোয়ার্ক

গত শতকের গোড়ার দিকে পরমানুর গঠন সম্পর্কে যখন বিজ্ঞানীরা ধারণা দিতে শুরু করলেন তখন একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল পরমাণুর গঠনে ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস তথা প্রোটন নিউট্রন দরকার।

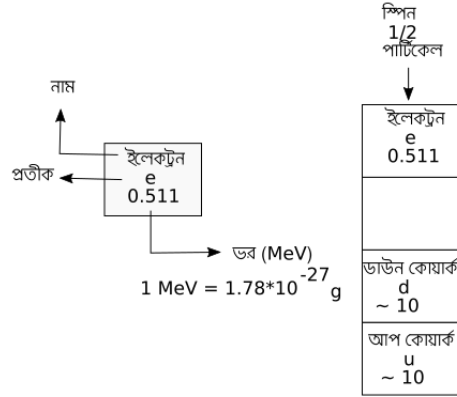
কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল যখন কেউ ব্যাখ্যা করতে পারল না নিউক্লিয়াসে প্রোটন-নিউট্রন কিভাবে শক্তভাবে আবদ্ধ থাকে। এটা বুঝা যাচ্ছিল যে প্রোটন-নিউট্রনের মধ্যে ফোটন কণার আদান-প্রদান দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ একটি ইলেকট্রনকে পরমাণু থেকে মুক্ত করতে যে শক্তি প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক বেশী শক্তি প্রয়োজন নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন নিউট্রন আলাদা করতে। এই কারণে ডায়নামাইটের চেয়ে পারমানবিক বোমা অনেক বেশি শক্তিমালী।

ডায়নামাইটে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা ইলেকট্রনের বিন্যাস পরিবর্তনের কারণে অন্যদিকে পারমানবিক বোমাতে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা প্রোটন নিউট্রনের বিন্যাস পরিবর্তনের কারণে।

তো নিউক্লিয়াসে প্রোটন-নিউট্রন কিভাবে থাকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ত্বরক যন্ত্র দিয়ে নিউক্লিয়াস ভাঙা হল। আশা করা হচ্ছিল সেখান থেকে প্রোটন-নিউট্রন বের হবে কিন্তু পর্যাপ্ত শক্তি প্রদানে নতুন নতুন কণা আবিষ্কার হতে শুরু করল। প্রথমে তাদের নাম দেয়া হল পাইওনস, ল্যাম্বডাস, সিগমাস, বোস এইভাবে। তারপর নাম দেওয়া হল ভরের ভিত্তিতে যেমন সিগমা 1190 এবং সিগমা 1386। খুব দ্রুতই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন শক্তির ভিন্নতার উপর নির্ভর করে নিউক্লিয়াস ভাঙলে নতুন নতুন কণা আবিষ্কার হতেই থাকবে। এখন পর্যন্ত চারশরও বেশি পার্টিকেল খুঁজে পাওয়া গেছে। এই পার্টিকেলগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করার জন্য ম্যুরে গ্যালম্যান ১৯৭০ সালে একটি থিওরী প্রদান করেন— যার নাম QUANTUM THEORY OF STRONG INTERACTION। নাম QUANTUM THEORY OF STRONG INTERACTION। এই থিওরীই হচ্ছে কোয়ান্টাম ক্রোমোডায়নামিক্সের মূল ভিত্তি সেখানে কোয়ার্ক মূল ভূমিকা পালন করে। কোয়ার্ককে দুই ভাগে

ভাগ করা যায় যে প্রোটন-নিউট্রন যে ধরনের কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি তার নাম বেরিওনস।

(২) আরেক ধরনের কোয়ার্ক আছে যার নাম মেসন আমরা যদি কণাগুলোকে ছকাকারে লিখতে চাই তাহলে ছকটা দাড়ায় এমন



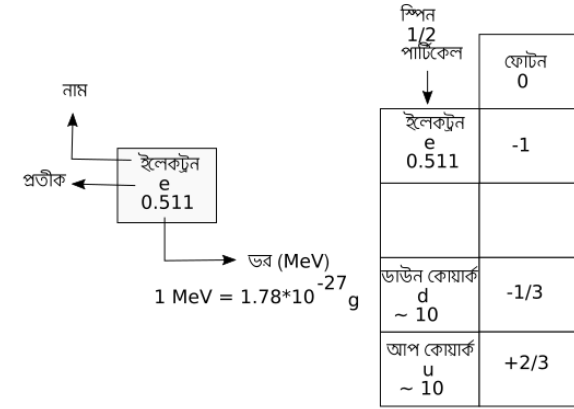
চিত্র ৬৬: পাশের যে ছকটি দেখা যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় $\frac{1}{2}$ স্পিন পার্টিকেলের ছক। একটা মজার ব্যাপার দেখ ছকটার একটি ঘর ইচ্ছে করেই ফাঁকা রাখা হয়েছে। কিন্তু কেন?

চিত্র-৬৬ তে আঁকা ছকটি আরো পরিপূর্ণ হয় যদি ফোটনের সাথে কণাগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। আগেই বলেছি ইলেকট্রনের চার্জ সৃষ্টির রহস্য ফোটন কণার আদান-প্রদান। ইলেকট্রনের চার্জের মান -1 । ডাউন নামক কোয়ার্ক ও ফোটন আদান-প্রদান করে ফলে এরও চার্জ আছে। এই

চার্জের মান $-\frac{1}{3}$ । অন্যদিকে আপ নামক কোয়ার্কের জন্য এই মান $+\frac{1}{3}$ ।

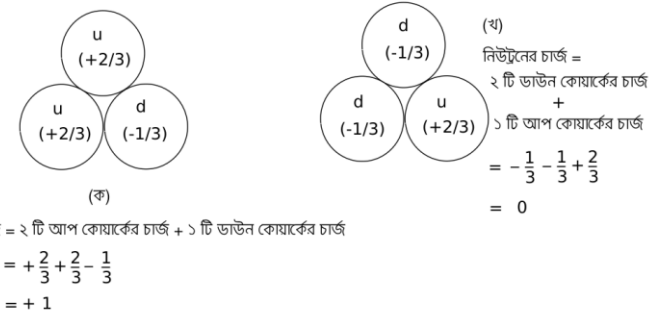
তোমরা কি জান ধনাত্মক চার্জ ও ঋণাত্মক চার্জ এই নামগুলো কে দেন? বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। এই নামগুলো দেন। উনি বলেছিলেন চার্জের মান সর্বদা পূর্ণসংখ্যা হতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা খুব বড় বাঁচা বেচে গেছে।

চিন্তা কর তা না হলে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন ডাউন কোয়ার্কের মান $-\frac{1}{3}$ বসাতে রাজি হতেন না।



চিত্র ৬৭: কণাগুলোর ফোটন কণা আদান-প্রদানের কারণে চার্জ সৃষ্টি হয়। ফোটনের সাথে কণাগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করে ছকটি আঁকা হয়েছে।

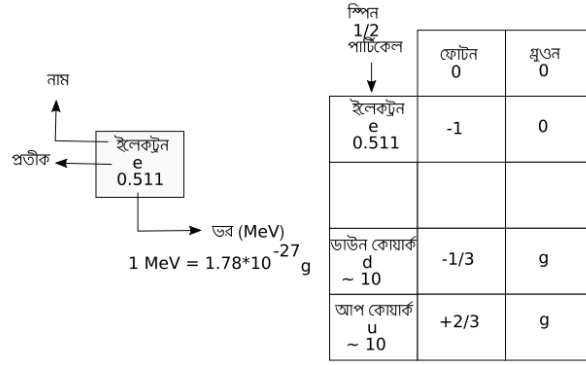
প্রোটনের চার্জ $+1$ এবং নিউট্রনের চার্জ 0 । কারণ হচ্ছে প্রোটন দুইটি আপ কোয়ার্ক এবং 1 টি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে তৈরী। অন্যদিকে নিউট্রন দুইটি ডাউন কোয়ার্ক এবং একটা আপ কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি।



চিত্র ৬৮: প্রোটনের চার্জ $+1$ এবং নিউট্রনের চার্জ 0 ।

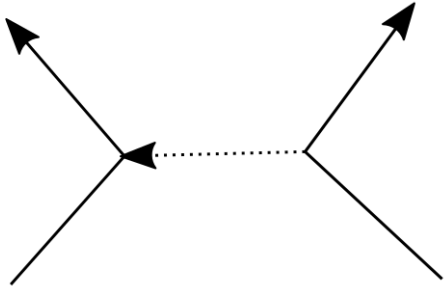
আমরা এতক্ষণে বুঝলাম প্রোটন এবং নিউট্রন দুইটি কোয়ার্ক দিয়ে তৈরী। কোয়ার্ক দুইটির নাম ডাউন কোয়ার্ক এবং আপ কোয়ার্ক। প্রশ্ন হচ্ছে এই ডাউন কোয়ার্ক এবং আপ কোয়ার্ক কোন শক্তির প্রভাবে আবদ্ধ থাকে। কোয়ার্কগুলোকে একসাথে রাখে গ্লুয়ন। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে গ্লুয়নেও ফোটনের মত স্থানান্তর হয়। ফলে ফোটন ও গ্লুয়ন উভয়ই স্পিন 1 পার্টিকেল নামে পরিচিত। পার্থক্য এতটুকু ইলেকট্রন গ্লুয়ন আদান আদান-প্রদান করে

না অন্যদিকে কোয়ার্ক গুয়ন আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদানকে g দিয়ে প্রকাশ করা হয়।



চিত্র ৬৯: গুয়ন কণার আদান-প্রদান হয় কোয়ার্কের মধ্যে এই আদান-প্রদানকে g দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ইলেকট্রনের সাথে গুয়ন আদান-প্রদান হয় না বিধায় 0 বসানো হয়েছে।

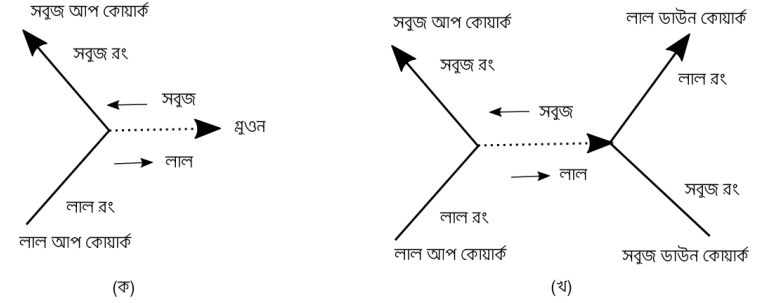
কোয়ার্ক গুয়ন কণা আদান-প্রদান করায় কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স দিয়ে কোয়ার্ক-গুয়ন সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা সম্ভব।



চিত্র ৭০: ইলেকট্রন, ফোটনের মতই কোয়ার্ক-গুয়নের আচার-আচরণ কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স দিয়ে ব্যাখ্যা সম্ভব। পাশের চিত্রে দুইটি কোয়ার্ক গুয়ন আদান-প্রদান করছে তা দেখানো হয়েছে।

কোয়ার্ক রং সৃষ্টির রহস্য হচ্ছে কোয়ার্ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে লাল (R) নীল (B) সবুজ (G) এই তিন রঙের যে কোন একটি রঙে থাকতে পারে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোয়ার্ক রং পরিবর্তন করতে পারে গুয়ন আদান-প্রদানের মাধ্যমে। ৮টি ভিন্ন ভিন্ন গুয়ন আদান-প্রদানের মাধ্যমে

কোয়ার্ক রং পরিবর্তন করতে পারে। যেমন একটি লাল কোয়ার্ক সবুজ কোয়ার্কে পরিণত হয় যখন কোয়ার্কটি লাল অ্যান্টি সবুজ (RED-ANTIGREEN) গুয়ন নির্গমন করে। লাল-অ্যান্টি সবুজ (RED-ANTIGREEN) গুয়ন হচ্ছে এমন এক গুয়ন যা কোয়ার্ককে সবুজ রঙ দেয় এবং লাল রঙ নিয়ে নেয়।

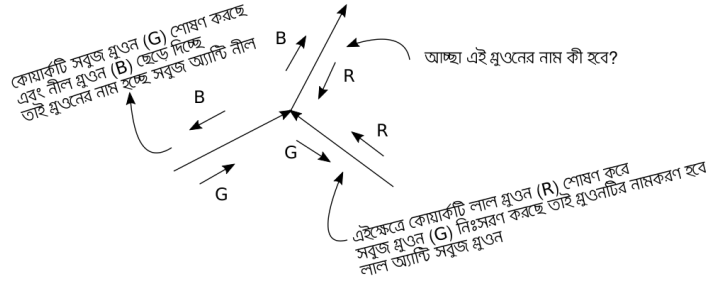


চিত্র ৭১: (ক) তে দেখানো হয়েছে একটি লাল আপ কোয়ার্ক সবুজ আপ কোয়ার্কে পরিণত হবে যখন সবুজ রং শোষণ করে এবং আপ কোয়ার্কের লাল রং যখন গুয়ন নিয়ে নেয়। এই ধরনের গুয়নের নাম হচ্ছে লাল-অ্যান্টি সবুজ (RED-ANTI GREEN) গুয়ন। (খ) তে গুয়ন কণার আদান-প্রদান দেখানো হয়েছে। লাল-অ্যান্টি সবুজ (RED-ANTI GREEN) গুয়ন কণা সবুজ ডাউন কোয়ার্কের কাছে গেলে সবুজ ডাউন কোয়ার্ক লাল রং শোষণ করে লাল ডাউন কোয়ার্কে পরিণত হয়।

চিত্র ৭১-এ একটা ব্যাপার স্পষ্ট একটি কোয়ার্ক কি রঙে পরিণত হবে তা নির্ভর করে কোন রংটি তার কাছে হাজির হচ্ছে তার উপর। কোয়ার্কের এই রং কিন্তু আসলে রং নয়।

চিত্র ৭১ (ক) এ লাল আপ কোয়ার্কে সবুজ রং হাজির হয় ফলে লাল আপ কোয়ার্কটি সবুজ আপ কোয়ার্কে পরিণত হয়।

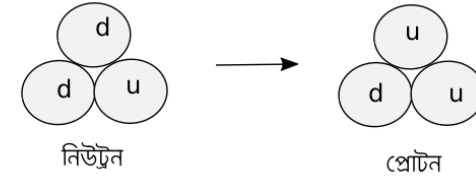
গুয়ন সেহেতু রং বহন করে তাই কোয়ার্কটি কোন দিকে যাচ্ছে এবং সেইদিকে কোন রং এর গুয়ন যাচ্ছে ও কোন রং সেখান থেকে চলে যাচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে বলে দেয়া সম্ভব কোয়ার্কটি নতুন কি রঙে পরিণত হবে এবং গুয়নের নাম কি হবে?



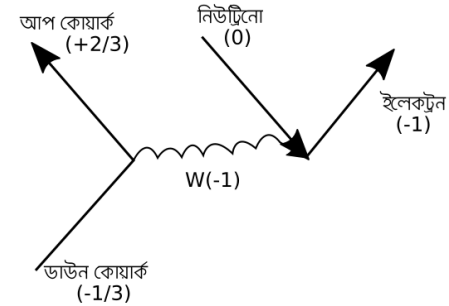
চিত্র ৭২: একটা ব্যাপার খেয়াল কর গুয়ান নামকরণের সময় যেই রং চলে যাচ্ছে তার আগে অ্যাঙ্কি বসাতে হয়। তাহলে পাশের চিত্রে একটি কোয়ার্ক থেকে নীল (B) রং চলে গেলে এবং কোয়ার্কটি লাল রং-এ পরিণত হলে সেই গুয়ানের নাম কি হবে বলতে পারবে?

বিটা রশ্মির বিকিরণ

একটি নিউট্রন যখন প্রোটনে পরিণত হয় তখন তাকে বলা হয় বিটা ক্ষয়। বিটা ক্ষয় হওয়ার কারণে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই কারণে বলা হয় বিটা রশ্মি আসলে ইলেকট্রন। ফলে নিউট্রন যখন প্রোটনে পরিণত হয় তখন সে একটা ইলেকট্রন নির্গত করে। চিত্র-৬৮-এ আমরা দেখেছি নিউট্রন দুইটি ডাউন কোয়ার্ক, 1টি আপ কোয়ার্ক দিয়ে তৈরী অন্যদিকে প্রোটন দুইটি আপ কোয়ার্ক ও 1টি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে তৈরী। বিটা ক্ষয়ের সময় একটি ডাউন কোয়ার্ক 1টি আপ কোয়ার্কে পরিণত হয় ফলে নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয় এবং পরিবর্তনের সময় ফোটনের মত একটি কণা নির্গত হয় যার নাম W। ফোটন থেকে যেমন ইলেকট্রন ও পজিট্রন তৈরি হয়, W থেকে তেমনি নিউট্রিনো এবং ইলেকট্রন তৈরি হয়।



চিত্র ৭৩: বিটা ক্ষয়ের সময় নিউট্রনের একটি ডাউন কোয়ার্ক আপ কোয়ার্কে পরিণত হয়। ফলে নিউট্রন প্রোটন হয়ে যায়।



চিত্র ৭৪: একটি ডাউন কোয়ার্ক আপ কোয়ার্কে পরিণত হওয়ার সময় ফোটনের মত নতুন একটি কণা নির্গত করে যার নাম W। W থেকে তৈরি হয় নিউট্রিনো এবং ইলেকট্রন।

চিত্র-৭৪ এ খেয়াল করে দেখ নিউট্রিনোর গতির দিক ইলেকট্রনের বিপরীত দিকে। নতুন এই কণা নিউট্রিনোর আধান নেই। কিন্তু এটি ইলেকট্রন এবং কোয়ার্কের মতই একটি পার্টিকেল যার স্পিন $\frac{1}{2}$ ।

নিউট্রিনো গুয়ন, ফোটন কোন কিছুই আদান-প্রদান করে না সে শুধু W আদান-প্রদান করে।

চিত্র ৭৪ থেকে বুঝা যাচ্ছে $-\frac{1}{3}$ চার্জ বিশিষ্ট ডাউন কোয়ার্ক যখন $+\frac{2}{3}$ চার্জবিশিষ্ট আপ কোয়ার্কে পরিণত হওয়ার সময় তখন W কণা নির্গমণ করে। অর্থাৎ W কণা ডাউন কোয়ার্ক নেকে -1 চার্জ নিয়ে নেয় এবং W কণা ভেঙে নিউট্রিনো এবং -1 চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রনে পরিণত হয়।

চিত্র-৬৬ এর টেবিলটাতে দেখ ইলেকট্রনের নিচে একটি ঘর ফাকা রাখা হয়েছে। এইবার আমরা সেই ঘরটি পূরণ করব নিউট্রিনো দিয়ে। একটা মজার ব্যাপার দেখ একটি ডাউন কোয়ার্ক আপ কোয়ার্কে পরিণত হওয়ার সময় W কণা নির্গমণ করে এবং নির্গত সেই W কণা ভেঙে নিউট্রিনো ও ইলেকট্রন তৈরি হয়।

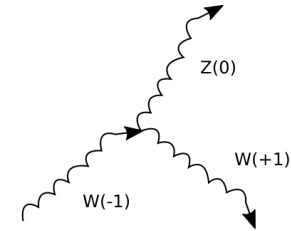
ফলে পুরো ছকটি দাড়ায় চিত্র-৭৫ এর মত—

নাম	স্পিন $\frac{1}{2}$ পার্টিকেল	ফোটন 0	গুণন 0	W ~ 80000
ইলেকট্রন e 0.511		-1	0	←
নিউট্রিনো ν_e ~ 0		0	0	←
ডাউন কোয়ার্ক d ~ 10		-1/3	g	←
আপ কোয়ার্ক u ~ 10		+2/3	g	←

চিত্র ৭৫: W কণা ইলেকট্রন ও নিউট্রিনোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কোয়ার্কদ্বয়ের মধ্যেও W কণা সম্পর্ক আছে। পাশের চিত্রে সেটি দেখিয়ে পুরো ছকটি পূরণ করা হয়েছে। একটি মজার তথ্য দিয়ে রাখি যখন একটি ডাউন কোয়ার্ক থেকে W_- কণা চার্জ নিয়ে আপ কোয়ার্কে পরিণত হয় (চিত্র-৭৪) তখন W কণাটির নাম হয় W_- অন্যদিকে একটি আপ কোয়ার্ক থেকে $+1$ চার্জ নিয়ে ডাউন কোয়ার্কে পরিণত হওয়ার সময় W কণার নাম হয় W_+ ।

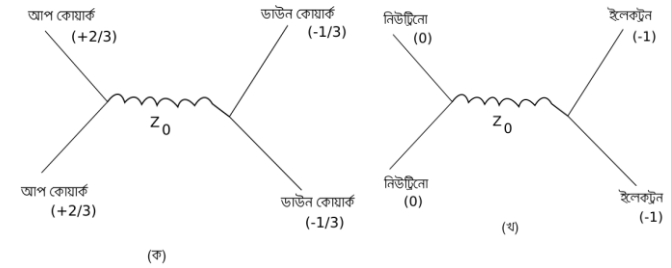
সবল এবং দূর্বল নিউক্লিয় বল

ফোটন এবং গুয়ন কণার মত আরো এক ধরনের পার্টিকেল আছে যা W এবং W_+ কণা থেকে তৈরি হয়। নতুন এই কণার চার্জ শূন্য হওয়ায় তার নাম নিউট্রাল W। তাকে আরো একটি নামে ডাকা হয় Z_0 ।



চিত্র ৭৬: W_- এবং W_+ কণা একসাথে মিলিত হলে নতুন একটি কণা তৈরি হয় তার নাম Z_0 । এর চার্জ শূন্য। ফলে Z_0 কণা আদান-প্রদানের ফলে চার্জের কোন পরিবর্তন হয় না।

Z_0 কণার চার্জ শূন্য হওয়ায় Z_0 কণা আদান-প্রদানের কারণে চার্জের মানের কোন পরিবর্তন হয় না। ফলে কণাটি অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে।



চিত্র ৭৭: (ক) তে দেখানো হয়েছে আপ কোয়ার্ক এবং ডাউন কোয়ার্কের মধ্যে Z_0 কণার আদান-প্রদান হওয়ায় কোয়ার্কদ্বয় অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। ঠিক একইভাবে (খ) তে দেখানো হয়েছে নিউট্রিনো এবং ইলেকট্রনের মধ্যে Z_0 আদান-প্রদান হওয়ায় উভয়ই অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে।

আধানের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় চিত্র 77 এর আদান-প্রদানকে নিউট্রাল প্রবাহ বলা হয়।

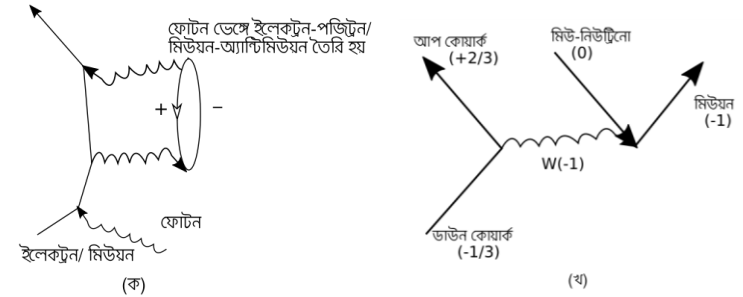
দেখ আমরা কিন্তু W_- , W_+ , Z_0 এবং ফোটন কণার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছি। স্টিফেন ওয়াইনবার্গ এবং প্রফেসর আবদুস সালাম কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিক্স দিয়ে এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এবং এর নাম দেন দূর্বল নিউক্লীয় বল।

আমরা কোয়ার্ক এবং গ্লুনের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখলাম তা হচ্ছে সবল নিউক্লীয় বল। আর ফোটন কণা হচ্ছে তড়িৎ-চৌম্বকীয় বলের ফলাফল।

দেখ আমরা মহাকর্ষ বল ব্যতীত বাকী ৩টি মৌলিক বল-সবল এবং দূর্বল নিউক্লীয় বল, তড়িৎ-চৌম্বক বল ব্যাখ্যা করে ফেলেছি।

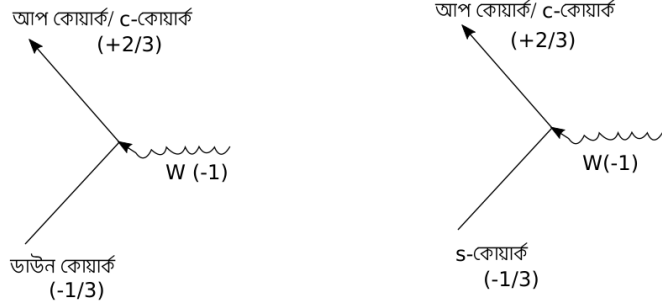
আরো আরো পার্টিকেল

নিউক্লিয়াসকে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন প্রোটন দিয়ে আঘাত করার ফলে আরো নতুন নতুন কণা আবিষ্কার হতে থাকল। এমনই একটি কণা হচ্ছে মিউয়ন যার ধর্ম প্রায়ই ইলেকট্রনের মত কিন্তু ইলেকট্রনের তুলনায় এটি প্রায় 206 গুণ ভারী। এটির ভর 105.8 MeV এটি ইলেকট্রনের মতই ফোটন কণা আদান-প্রদান করে। এটি একটি প্রতিকণাও আছে- অ্যান্টি মিউয়ন তার নাম। ফোটন ভেঙে যেমন ইলেকট্রন পজিট্রন তৈরি হয় তেমনি মিউয়ন-অ্যান্টিমিউয়নও তৈরি হয়।



চিত্র ৭৮: (ক) ইলেকট্রনের চেয়ে ভারী কিন্তু একই ধর্ম বিশিষ্ট মিউয়ন এবং মিউয়নের প্রতিকণা সৃষ্টি হয় ফোটন কণা ভেঙে। (খ) বিটা রশ্মি বিকিরণের সময় যে W কণা নির্গত হয় সেটি ভেঙেও মিউয়ন এবং মিউনিউট্রিনো সৃষ্টি হয় যাদের আচার-আচরণ যথাক্রমে ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনোর মত।

ডাউন কোয়ার্কের চেয়ে ভারী কিন্তু একই ধর্মবিশিষ্ট একটি কণা আছে যার ভর 200 MeV নাম s কোয়ার্ক। আবার আপ কোয়ার্কের মতই ভারী আরেকটি কণা আছে যার নাম C কোয়ার্ক। ধর্ম একই হওয়ায় ডাউন কোয়ার্ক বিটা ক্ষয় হয়ে যেমন আপ কোয়ার্ক তৈরি করে তেমনি C কোয়ার্কও তৈরি করে। s কোয়ার্কও বিটা ক্ষয় করে আপ কোয়ার্ক অথবা C কোয়ার্কে পরিণত হয়। কোয়ার্কগুলো আবার গ্লুয়ন কণাও আদান-প্রদান করে।



চিত্র ৭৯: ডাউন কোয়ার্ক এবং s কোয়ার্ক উভয়ই W₋ কণা নির্গমনের মাধ্যমে আপ কোয়ার্ক অথবা C কোয়ার্কে পরিণত হয়। s কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্কের চেয়ে ভারী কিন্তু একই ধর্ম বিশিষ্ট ঠিক একইভাবে আপ কোয়ার্কের চেয়ে C কোয়ার্ক ভারী কিন্তু চার্জ একই।

নিউক্লিয়াসকে আরো উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রোটন দিয়ে আঘাত করা হলে ইলেকট্রন, মিউয়নের চেয়ে ভারী কিন্তু একই ধর্ম সম্পন্ন নতুন কণা পাওয়া যায় যার নাম টাউ। আবার W কণা ভেঙে টাউ নিউট্রিনো তৈরি হয় W কণা নির্গমনের ফলে s কোয়ার্কের চেয়ে ভারী b কোয়ার্ক তৈরি হয়। এভাবে চলতেই থাকে।

নাম	প্রতীক	ভর (MeV)	স্পিন	ফোটন	গ্লুওন	W
		1 MeV = 1.78*10 ⁻²⁷ g	1/2	0	0	~80000
ইলেকট্রন	e	0.511	↓			
টাউ	r	~1860		-1	0	←
মিউয়ন	u	1058		0	0	←
নিউট্রিনো	v _r	~0		0	0	←
কোয়ার্ক	b	~4800		-1/3	g	←
কোয়ার্ক	s	~200				
ডাউন কোয়ার্ক	d	~10				
কোয়ার্ক	c	~1800		+2/3	g	←
আপ কোয়ার্ক	u	~10				

চিত্র ৮০: নিউক্লিয়াসকে আরো উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রোটন দিয়ে আঘাত করার ফলে নতুন নতুন কণা আবিষ্কার হতে থাকে। দেখে মনে হয় যেন এটা চলতেই থাকবে।

আমি যখন এই কণার ধর্ম সম্পর্কে ছোটবেলায় জানতে পারলাম তখন একটা প্রশ্ন আমার মাথার ঘুরপাক খেত কণাগুলোর চার্জ এবং ভর সৃষ্টির রহস্য কি? এখন তোমরা জান চার্জ সৃষ্টি হয় ফোটন কণা আদান-প্রদানের কারণে। আর

ভর সৃষ্টি হয় হিগস বোসন কণার কারণে। কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা যখন হিগস-বোসন কণার সন্ধান খুঁজে পেলেন তখন তারা একটি দীর্ঘদিনের অমিমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন।

আমরাও জানতে পারলাম আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সত্যেন বোস কত বড় একজন বিজ্ঞানী। তোমরাও সবকিছু বুঝে কৌতুহলী মন নিয়ে পড়াশুনা করলে একদিন বড়সড় একজন বিজ্ঞানী হতে পারবে। নোবেল প্রাইজ পাবে- তখন এই দারিদ্রপীড়িত শত সমস্যার দেশের মানুষ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে গর্বভরে বলতে পারবে আমাদের ও পদার্থ, রসায়ন চিকিৎসাবিজ্ঞান, অর্থনীতিতে নোবেল লরিয়েট আছে- সেই দিনের প্রত্যাশায়!